সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতি ও তার বিবর্তন

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধীন
পি এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য
প্রদত্ত **গবেষণা অভিসন্দর্ভ**

গবেষক

দিলীপ কুমার বাড়ী

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর

২০১৬

VIDYASAGAR UNIVERSITY

P.O- Vidyasagar University, Midnapore-721102
Dist- Paschim Medinipur
Phone – (03222) 62297/6320/62441/60554/60555 : Extn. 335
Fax : (91) 03222 / 62329 / 64338, e-mail – vidya@dte.vsnl.net.in

Date : 06.05.2016

Dr. Monanjali Bandyopadhyay
Assistant Professor
Department of Bengali
Vidyasagar University

CERTIFICATE

This is to certify that the work described in the thesis "Subarnaraikhik Janajati - Sanskriti O Tar Bibartan" (সুবর্ণরৈখিক জনজাতি –সংস্কৃতি ও তার বিবর্তন) has been done by Mr. Dilip Kumar Bari, MA (Beng) under my guidance in Arts faculty (Bengali), Vidyasagar University, Midnapur.

Mr. Bari has duly acknowledge the help received by him in the course of the work and has fulfilled the requirements. He is being directed to submit his thesis for adjudication, neither the thesis in its present form nor any portion of it was submitted elsewhere for any degree or prize.

Monanjali Bandyopadhyay
Dr. Monanjali Bandyopadhyay

ব্যক্তিগত ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখার ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব দানের চেষ্টা হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সহায়ক গ্রন্থরূপে অনেকের গ্রন্থ, পুস্তিকা বা জার্নালকে অনুসরণ করেছি। আমি এও ঘোষণা করছি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে নিয়ে অন্য কোনো ডিগ্রীলাভে আবেদন করব না। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি কেবল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পি এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত হল।

ইতি -

বিনীত

দিলীপ কুমার বাড়ী

দিলীপ কুমার বাড়ী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেদিনীপুর

২০১৬

মুখবন্ধ

সংস্কৃতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মতো।জনজীবনের পরিশুদ্ধ ও শিল্পীত রূপই হল সংস্কৃতি। সেই প্রাচীন কাল থেকে মানব জীবনে এই বিশুদ্ধকরণের কাজ চলমান। এই চলমানতায় মানুষ নিজের কালের পুরানো সংস্কৃতিকে কখনো গ্রহণ, কখনো বর্জন করেছে।আবার এই গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়ার মধ্যে নতুনের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতি দেশ,কাল,মানুষ ও পরিবেশ ভেদে ভিন্ন রূপের হয়, তবে প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হলেও সকল ক্ষেত্রে আনন্দলাভই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আবার এর অন্তর্নিহিত সত্যটিও সর্বত্র এক। আসলে সংস্কৃতির হেরফের হয় রুচিবোধের তফাতে। রুচিবোধ সৃষ্টি হয় নৃত্যে, গীতে, চিত্রকলায়, স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে ও জীবনচর্যার নানা ছন্দে, এও বলা হয় বিশুদ্ধ নগর-জীবনের সংস্কৃতি স্থূল, সামাজিক জীবনের সংস্কৃতির চেয়ে অন্যতর। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাবও সংস্কৃতির উপর ক্রিয়াশীল। কিন্তু নগর বা পল্লী উভয় ক্ষেত্রেই সমকালের সৌন্দর্যচেতনায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সংস্কৃতির পরিধির ক্রমবিস্তার হয় জনমানসের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহের শিল্পে, সাহিত্যে, লোকায়ত জীবনচর্যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ‘সংস্কৃতি’ শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল ‘CULTURE’। আবার culture শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ‘কালতুরা’ (KALTURA) শব্দ থেকে।‘সংস্কৃতি’ শব্দের আক্ষরিক অর্থের ব্যাখ্যা হল সম্ + কৃতি অর্থাৎ সম্যকভাবে কর্ষণ জাত ফসল। একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত একই রকমের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রকাশই হল সংস্কৃতি। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক মারাঠি বন্ধুর কাছ থেকে সংস্কৃতির অন্য অর্থ কৃষ্টি বা কর্ষণজাত বলে জানতে পারেন। অর্থাৎ মানুষের অন্তর্হৃদয়ে কর্ষণজাত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির শিল্পীত রূপের বহিঃপ্রকাশই হল সংস্কৃতি। কথিত রয়েছে যে, “দৃশ্যমান জগতে মানুষ যা যা করে, তাই হল সংস্কৃতি”। নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজে এর রূপ পরিশীলিত, অন্যদিকে গ্রাম্যজীবনে যেখানে শিক্ষার আলো তেমনভাবে প্রবেশ করেনি সেখানে এর রূপ স্থূল।

সাম্প্রতিককালে ‘জনজাতি’ শব্দটি বহুল আলোচিত ও চর্চিত বিষয়। ইংরেজী ‘ট্রাইব’ (TRIBE) কথাটি জনজাতিকে নির্দেশ করে। নৃতাত্ত্বিকেরা ‘ট্রাইব’ বলতে বোঝেন, একই ভৌগোলিক অঞ্চলের বসবাসকারী গোষ্ঠী মানুষকে; যাঁরা একই সামাজিক ধারাবাহিকতায় অবস্থান করেন, একই ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত এবং একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে থাকবে ‘Common Language’, ‘Common Culture’, ‘Specific

Region'। প্রত্নপ্রস্তর যুগেই 'ট্রাইব' বা 'জন' এর উদ্ভব হয়েছিল। সাধারণত জনজাতি বলতে সেইসব জনগোষ্ঠীকে নির্দেশিত করা হয়, যাদের জীবন পরিচালিত হয় প্রথাগত আইন-এর দ্বারা। এঁরাই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী। বাংলার এই আদি-অধিবাসীদের মধ্যে যে জনগোষ্ঠীর প্রভাব সবথেকে বেশি এবং যারা অতি প্রাচীন, তাঁরা হলেন প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড।

আদিকাল থেকে বসবাসকারী জনজাতির জীবনযাপন প্রণালী ছিল সহজ-সরল, গোষ্ঠী নির্ভর, আনুগত্য নির্ভর এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল। প্রকৃতির উপর নির্ভরতা এদের সবথেকে বেশি। এঁরা একত্রিত বা সমবেতভাবে অবস্থান করে বলে এঁদের চিহ্নিত করা হয় গোষ্ঠীরূপে। 'গোষ্ঠী' শব্দটি 'ট্রাইব' শব্দের বাংলা ভাষান্তর। সুতরাং এটি বাংলা ভাষায় কখনো কখনো কৌম, কৌম-গোষ্ঠী কিংবা গোত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা 'জনজাতি' শব্দের পাশাপাশি অন্য যে নাম গুলিকে গ্রহণ করেছেন, সেগুলি হল 'আদিবাসী' (Aborigins), 'উপজাতি' (Tribes), 'আদিমজাতি', 'খণ্ডজাতি', 'প্রাকৃতজন', 'গিরিজন' ইত্যাদি।

এতো গেল সংকীর্ণ অর্থে 'জনজাতি' শব্দের প্রয়োগ। ব্যাপকার্থে 'জনজাতি' শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, 'জন' হলো লোক বা ব্যক্তি; আর 'জাতি' শব্দের অর্থ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় বসবাসকারী জনসমাজ, যাদের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, একই রকমের, জাতীয়তার স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত। নিম্ন জাতির এই মানুষ গুলি আসংখ্য গোষ্ঠী নির্মাণ করেছেন এবং প্রতিটি গোষ্ঠী তাঁদের মাতব্বর বা মোড়লের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। এঁরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল বহমানতা থেকে পৃথক স্বতন্ত্র একটি বলয় নির্মাণ করেছেন। তা সত্ত্বেও বলি 'ট্রাইব' শব্দের নানারকম অর্থ পরিভাষা হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। এই পরিভাষা গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আরণ্যক, পাহাড়িয়া, আদিবাসী, উপজাতি, আদিমজাতি, খণ্ডজাতি, ভূমিপুত্র, গিরিজন, জনজাতি, এই শব্দগুলির পাশে আর একটি শব্দ গৃহীত হতে পারে সেটি হল প্রাকৃতজন। লক্ষণীয় প্রতিটি পরিভাষার অন্তরালে রয়েছে গভীর আর্থ-সমাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য।

কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই জনজাতি গোষ্ঠীকে একটি কেন্দ্রমুখী স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে। যেমন -

এক ঃ- ধর্মীয় ক্ষেত্রে এঁরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী বলে গুপ্তবিদ্যাকে ভীষণভাবে মান্য করেন।

দুই ঃ- পার্বত্য অঞ্চলে নদী অববাহিকা মালভূমি এবং আরণ্যক জলা-জঙ্গলে পরিবেষ্টিত ভৌগোলিক অঞ্চলে এঁরা বাস করেন।

তিন ঃ- এঁরা একই ভাষায় কথা বলেন। জনজাতিদের এই ভাষা আঞ্চলিক এবং মূল ভাষা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

চার ঃ- আর্থিকভাবে এঁরা অত্যন্ত দুর্বল। মূলত ভূমিজীবী ও শিকারজীবী হওয়ায় শিল্পপ্রধান নাগরিক বিলাসবৈভব থেকে এঁরা বঞ্চিত। সর্বক্ষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে এঁদের জীবন সংগ্রাম যুক্ত হওয়ায় অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়েন।

পাঁচ ঃ- রাজনৈতিকভাবে এঁরা শৃঙ্খলিত। গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় যেকোনো রক্তক্ষয়ী আন্দোলনেও ঐক্যবদ্ধ থাকেন।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় হল সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতি ও তার বিবর্তন। ইতিপূর্বে ড. ছন্দা ঘোষাল তাঁর 'ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ' গ্রন্থে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা ভিত্তিক দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলা বা ডাঁয়া ঝাড়গাঁয়ী রূপ ও উত্তর পশ্চিমা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজন ও তাদের ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মৌখিক সাহিত্যের বর্ণনা দিয়েছেন। ড. বঙ্কিম কুমার মাইতি 'দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি' গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতি ও মৌখিক সাহিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক জীবেশ নায়েক তাঁর 'প্রসঙ্গঃ দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা' গ্রন্থেও এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার ড. সুধীর করণ তাঁর 'দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। উল্লেখ্য ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক ও অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ মিশ্রের রচিত গ্রন্থ যথাক্রমে 'বঙ্গ সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য' ও 'দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা' (গবেষণামূলক) প্রবন্ধে আমার গবেষণা কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে সামগ্রিকভাবে ঝাড়খন্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী সুবর্ণরেখা নদী অবাবহিকা অঞ্চলের জনজাতি - সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারা এবং আধুনিক ও উত্তর আধুনিক সংস্কৃতির ঘরানায় জনজাতি গোষ্ঠীর ক্রম-উত্তরণেব সৃষ্টিশীল নান্দনিকতাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

যেহেতু এই এলাকাটি নদী অববাহিকা অঞ্চল, সেহেতু এখানকার জীবনের সংস্কৃতি চর্চার পটভূমি রচনায় নদীর প্রভাব ব্যাপক। একদিকে কৃষিনির্ভর জীবন, অন্যদিকে মৎস্য শিকারের জীবন, এই উভয় ধারা এলাকার সংস্কৃতি চেতনাকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এই অববাহিকা অঞ্চলের লোকজীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় আজন্ম। তবু গবেষণা সূত্রে প্রাণের আবেগে ও দুরন্ত নেশায় সুবর্ণরেখা নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রতিটি অঞ্চলের কিছু কিছু স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্য তার সংস্কৃতির বিশিষ্ট পরিচয় দান করে। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে কিভাবে সেই বিশিষ্টতাকে রূপায়ণ করেছে, তা আমি বোঝার চেষ্টা করেছি Participant observation (প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ) ও Non-participant observation (পরোক্ষ অংশগ্রহণ) পদ্ধতির মাধ্যমে। পান্ডিত্যগৌরব, অহমবোধ, লোকায়ত জীবন চর্চার অন্তরায়, এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হয়েছি। কেননা এক্ষেত্রে অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। নদীতটে এক জাতের পোকা সুন্দর আলপনা আঁকে। এরা মানুষের শব্দে নিজেদের গুটিয়ে নেয় ও বালির ভেতরে ঢুকে পড়ে। ক্ষেত্রীয় সমীক্ষা সূত্রে ঠিক সেই অভিজ্ঞতাই আমার রয়েছে। এই অঞ্চলের সহজ সরল প্রাণের লোকায়ত জীবনকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, কৌতুহল বশে নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়েও Questionnaire Method (প্রশ্নকরণ পদ্ধতি) Focussed Interiew (নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত সাক্ষাৎকার), Repetitive Interview(সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত সাক্ষাৎকার), - এর মাধ্যমে ঐ সাংস্কৃতিক জীবনকে উপলবি্ধ করতে গিয়ে সে স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে পাইনি, অথচ সংস্কৃতি হল জীবনের স্বতোৎসারিত ছন্দময় বিকাশ, আর জনজাতি-সংস্কৃতি হল জন-জাতি জীবনের নান্দনিক বিকাশ। এছাড়াও গবেষণা অভিসন্দর্ভের ক্ষেত্রকর্মের জন্য নানান পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে সে গুলি হল Controlled observation, Non-controlled Observation, Structured Interview, Non-Structured Interview, Statistical Method (পরিসংখ্যান পদ্ধতি), Scheduled Method (কথন পদ্ধতি), Personal Interview(ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার), Group Interview (দলগত সাক্ষাৎকার) ইত্যাদি।

পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছি এই নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মাটিতে। জীবনের সেই প্রথম প্রহর থেকে যত দেখেছি, ততই এই অঞ্চলের প্রতি আমার ভালোবাসা নিবিড় হয়েছে। এই গবেষণা কর্মে মাটি ও মানুষের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা আমার মূল প্রেরণা।জনজাতি বলতে যা বুঝেছি সংশ্লিষ্ঠ অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি সমূহের সমষ্টি, যারা একই ভূখন্ডে বসবাস করে, প্রচলিত রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে ।

সুবর্ণরেখা নদীটি তিনটি রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যে বিস্তৃত। এই তিনটি রাজ্য হল- ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ও ওড়িশা। তাই জনজাতি সংস্কৃতির ভিওি মূল মিশ্র বা সমন্বয়ী সংস্কৃতির অন্দরেই প্রোথিত রয়েছে। গবেষণা কর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো নদীর উভয় তীরবর্তী

অঞ্চলের জাতিসমূহের (আদিবাসী সম্প্রদায়, তপশীলি সম্প্রদায় ও বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায়) সাংস্কৃতিক বিচিত্র ও বিশিষ্ট উপাদানকে আলোচনা করা। মিশ্র বা সমন্বয়ী সংস্কৃতি তাদেরই মুখ্য পরিচায়ক।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে সুবর্নরেখা নদীটি প্রবাহিত।নদীটির উৎপত্তিস্থান ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে। নির্দিষ্ট ভাবে রাঁচী থেকে অনতিদূরে সারেঙ্গা পর্বতমালার অন্তর্গত ওরম্যানঝি ব্লকের পিসকা বা নাগ্রি নামক স্থানের নিকট অবস্থিত হুড্রু জলপ্রপাত(৯৮ মিটার) থেকে উৎপন্ন। ঝাড়খন্ডের মানভূম, ইঁচাগড়, সিংভূম, চাণ্ডিল, জামশেদপুর, ঘাটশিলা, ধলভূমগড়, বহড়াগোড়া, বামডোল, করতনালা হয়ে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার সিরসা, পান্ড্রা, জামশোলা নামক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোপীবল্লভপুরের ১নং থানার তেঘরি ও দহমুন্ডা নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। রাঁচী জেলার অন্তর্গত গেতলসুদ বাঁধ এই নদীর উৎসক্ষেত্রের বারিপ্রবাহের মুখ্য যোগানদার বলে চিহ্নিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশে স্থানের কিছু পূর্ব থেকেই এই নদীর উভয় তীর পলিময় ভূমি। এই পলিমিশ্রিত মৃত্তিকা কৃষির উপযুক্ত।

<u>সুবর্ণরেখা নদীরমানচিত্র</u>

সুবর্ণরেখা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৯৫ কি.মি. (২৪৫ মাইল) উচ্চ অববাহিকার বিস্তার প্রায় ২৫২ কিমি। পাহাড়ী ভঙ্গুর অরণ্যভুমি। এর বামতীরের উপনদী হল ডুলুং এবং ডানতীরের উপনদীগুলি হল - কাঞ্চী, খড়গাই, করকারী, রারু ও গাড়ু ইত্যাদি। উৎসস্থানের উচ্চতা ৬১০ মিটার (২০০ ফিট) দ্রাঘিমা ২৩° ১৮′ উত্তর অক্ষাংশ ৮৫°১১′ পূর্ব এবং মোহনার দ্রাঘিমা ২১°৩৩′ ১৮″ উত্তর ও অক্ষাংশ ৮৭°২৩′ ৩১″ পূর্ব। অববাহিকা অঞ্চলের বিস্তার ১৮,৯৫১ বর্গকিমি। ঝাড়খন্ডে ১৩,৫৯০ বর্গকিমি ওড়িশায় ৩,২০১ বর্গকিমি ও পশ্চিমবঙ্গে এর বিস্তার ২,১৬০ বর্গ কি.মি.। অধিবাসীদের মধ্যে জনজাতিদের প্রাধান্য। কোল, সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, শবর, হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, কামার, কুম্ভকার, ধীবর, কৈবর্ত্য, নমশূদ্র,

ছাড়াও অনগ্রসর বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস এই অঞ্চলে। সাঁওতালি-মুন্ডারী-কোলীয় ভাষা, মাহাতোদের ভাষা। ওড়িয়া মিশ্রিত বাংলা ভাষাও এদের মধ্যে প্রচলিত। জনজাতিরাই সাংস্কৃতিক জীবনে মুখ্য পরিচালিকা শক্তি।

নদীর নিম্ন অববাহিকার কিছু অংশে গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, কেশিয়াড়ি, নয়াগ্রাম, দাঁতন ১নংথানার বিস্তীর্ণ এলাকা। বঙ্গোপসাগরে পড়ার আগে কিছুপথ উওর বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর, রাজঘাট ও ভোগরাই থানার অন্তর্গত কীর্তনীয়া বন্দর ও চন্দ্রবালের নিকট কাঁকড়াঝোল ঘাট ও কশাফলি ঘাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীর গতিপথ বর্তমানে তিনটি রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৩ কি.মি.। ওডিশায় এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৫ কি.মি.।

নিম্ন অববাহিকায় স্পষ্টতঃ, দুটি ধাপ। এক গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, কেশিয়াড়ির নাতি উচ্চভূমির ধাপ। দুই ,দাঁতন , সোনাকনিয়া, জলেশ্বর রাজঘাট, তালসাবির নিম্নভূমির ধাপ, মোহানাভূমির ধাপ। নদীর উচ্চভূমি ছোটনাগপুরের ক্ষয়িত নিম্নাভিমুখী অংশ ভঙ্গিল পাথুরে ও লাল কাঁকুরে মাটি।

সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা অববাহিকা অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর আধিষ্ঠান লক্ষ্য করা গেছে। শীতলা, মনসা, কালী, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবী বাংলাদেশের অন্যত্র যেমন পূজিত তেমনি এখানেও পূজিত এবং দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস দৈনন্দিন কর্মপ্রকল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুবর্ণরেখা নদীর অবাবাহিকা অঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃতিতে মিশ্র রূপ লক্ষ্য করা যায়। সভ্যতার অগ্রগতি ও নাগরিক সংস্কৃতির প্রাধান্যে সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ফলস্বরূপ জনজাতির লোকেরা প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে আধুনিকতার পথে পা বাড়িয়েছে। এই মতের ভিত্তিতে আধুনিক বৃহৎ বঙ্গ-সংস্কৃতির মধ্যে সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী জনজাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়েছি। এই আগ্রহকে বাস্তব রূপ দিতে যারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার গবেষণার বিষয় নির্ধারণে আমাকে আগ্রহী করেছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. ছন্দা ঘোষাল। গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রাথমিক স্তরে তথ্য, তথ্যসূত্র ও স্তর বিভাজনে সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধাস্পদ দাঁতন কলেজের অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ মিশ্র। আমাকে গবেষণা কর্মে অকুন্ঠ সহযোগিতা করেছেন লোকসংস্কৃতি ও জনজাতি-সংস্কৃতি বিষয়ের সফল গবেষক কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তপন বিশ্বাস এবং হিজলী কলেজের অধ্যাপক ড. সুবিকাশ জানা, ঝাড়গ্রাম রাজকলেজের অধ্যাপক জীবেশ নায়েক। সর্বোপরি, আমার গবেষণা কর্মকে পুর্ণতর রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি আমার গবেষণা কর্মের

অভিভাবক, তত্বাবধায়ক, প্রেরণা দাত্রী বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি স্বীকার করি তাদের অবদানকে যারা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। গড়বেতা অঞ্চলের সুপরিচিত শিক্ষক মানুরাই সরেন, সুবর্ণরেখা কলেজের অতিথি অধ্যাপক সৌকত আলি শাহ, অধ্যাপক লক্ষীন্দর পালুই, শিক্ষক শশধর দে, সহশিক্ষক বন্ধু সনাতন শীট ও রমেশ উথ্‌াসিনী, আমার প্রিয় ছাত্র প্রতিম আকুল চন্দ্র গুরু, সুশান্ত বেরা, দিলীপ বেরা, একাদশী বাড়ী, কার্ত্তিক সরেন, সঞ্জীব কুমার বেরা, মিহির বেরা, পদ্মলোচন হাঁসদা প্রমুখ। আমাকে অকৃত্রিম আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, নানান সময়ের মুদ্রণ সহায়ক ও প্রেরণা দাতা শিক্ষক বন্ধু অতনু পট্টনায়েক ও বন্ধুবর তারক বেরার অবদানকেও।

সর্বশেষে স্বীকার করি, তাদের অবদানকে যারা আমাকে পারিবারিক চাপমুক্ত রেখে সময় যুগিয়েছেন, আমার বাবা, মা, সহধর্মিণী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা ভিন্ন একাজ সম্পূর্ণ হত না।

ইতি -

বিনীত

দিলীপ কুমার বাড়ী

দিলীপ কুমার বাড়ী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেদিনীপুর

২০১৬

তাং - **০৬/০৫/২০১৬**

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

	পৃষ্ঠা
সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকার মানচিত্র	১২
প্রথম অধ্যায়	১৩- ৩৯
সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী এলাকা সমূহের জনসংখ্যা, জনবিন্যাস ও জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়।	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৪০-৪৬
আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে জনজাতি-সংস্কৃতির বিবর্তন।	
তৃতীয় অধ্যায়	৪৭-১০৪
সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতি ও তার সামগ্রিক পরিচয়	
চতুর্থ অধ্যায়	১০৫-১৩০
সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আধুনিক বৃহৎ বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যে জনজাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য	
উপসংহার	১৩১-১৩৩
গ্রন্থপঞ্জি	১৩৪-১৩৮
সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানের চিত্র সমূহ	১৩৯ - ১৪১

সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের মানচিত্র

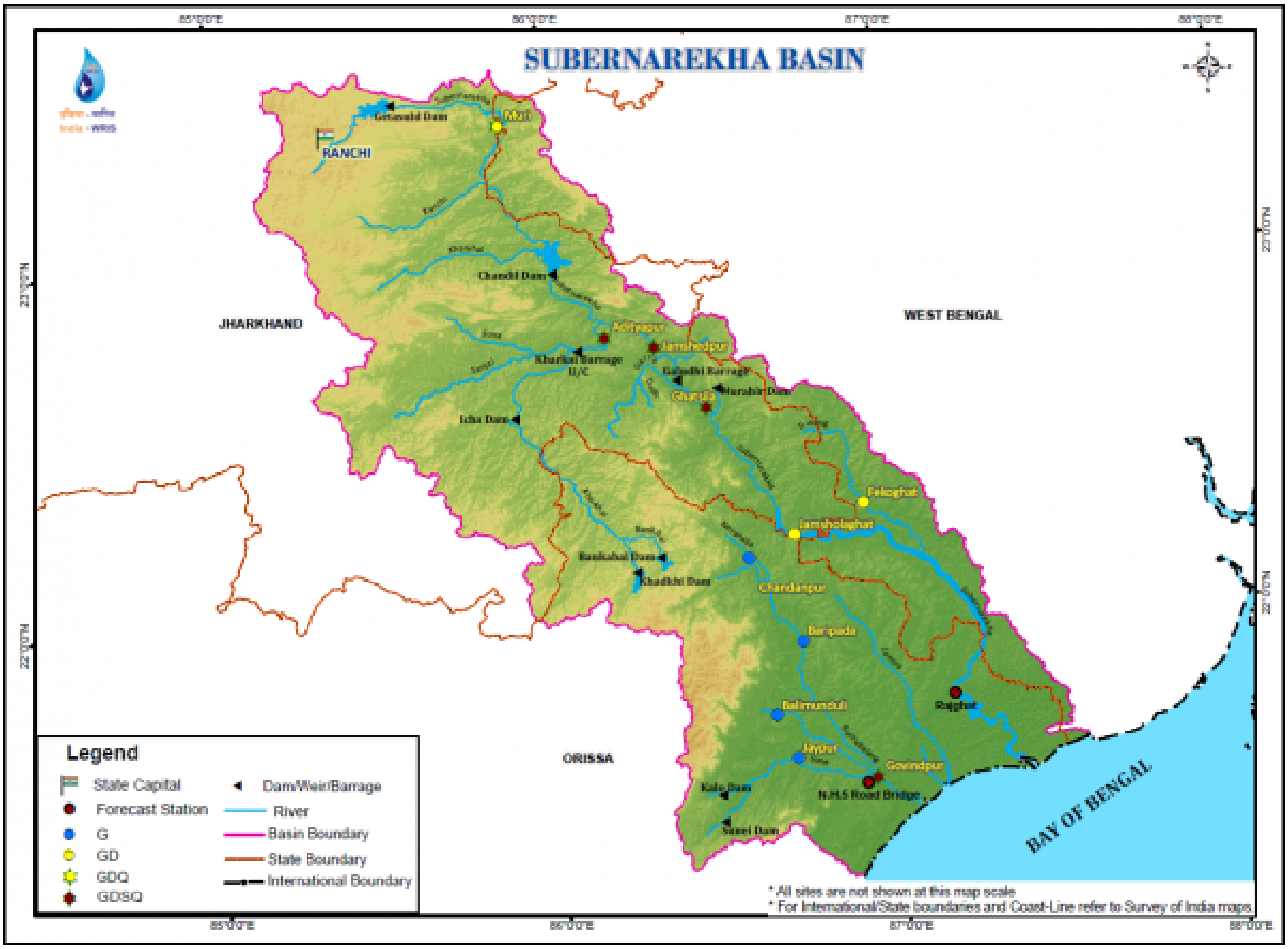

।। প্রথম অধ্যায় ।।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী এলাকা সমূহের জনসংখ্যা, জনবিন্যাস ও জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়।

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য নদীর নাম সুবর্ণরেখা। ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশার সীমান্ত এলাকার নদী সুবর্ণরেখা। ঝাড়খন্ডের রাঁচী জেলা থেকে এর উৎপত্তি। জামশেদপুর, চান্ডিল, ঘাটশিলা, ধলভূমগড় পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম ও দাঁতনের জলবিভাজিকা, বালেশ্বরের সমুদ্রসংগম। ঝাড়খন্ডের রাঁচি, জামশেদপুর, ইঁচাগড়, চান্ডিল, মানভূম, সাঁকচি, ঘাটশিলা, মহুলিয়া, মুসাবনি, বহড়াগোড়া, মানুষমুড়িয়া, ডোমজুড়ি, পাঁচান্ডো এবং ওডিশার জামশোলাও এই নদী অববাহিকা অঞ্চলের অন্তর্গত। সুবর্ণরেখা অববাহিকা অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতিদের বসবাস। যেমন সাঁওতাল, কোল, ভূমিজ, মুন্ডা, কোড়া, লোধা, শবর, মাহালি। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ধীবর, কামার, কুমোর, কুড়মি, বাগাল, হাড়ী, ডোম, মুচি, মেথর, যুগী, কৈবর্ত্য, মাল, মাঝি, নমশূদ্র, শুঁড়ি, মাহিষ্য (চাষা), বৈদ্য, কায়স্থ, তেলি, করণ, রাজু, সদগোপ, উৎকলীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। বিশেষ ভাবে বলা যেতে পারে অববাহিকা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় জনজাতিদের বসবাস।

রাঁচীর হুড্রু জলপ্রপাত

সাঁওতালি ও কোলীয় ভাষায় প্রচলিত স্বর্ণজ্ঞাপক শব্দ 'সানাম' এই নদীর নামকরণের তাৎপর্যকে ইঙ্গিত করে। নদীর উৎসভূমিতে রাঁচীর সোনাহাতু একটি সাঁওতালি অধ্যুষিত গ্রাম। স্বর্ণস্মৃতি বহনে আরও প্রামাণ্য রয়েছে, সোনাকনিয়া(দাঁতন), সোনারিমারা (গোপীবল্লভপুর-১নং ব্লক) সোনামুখী (রামনগর) প্রভৃতি সীমাখন্ডের গ্রামের নাম। তাছাড়া সুবর্ণ নামটি বড় বেশি অভিজাত।[১]

ময়ূরভঞ্জে সুবর্ণরেখা নদীর অন্য নাম শবররখা। শবররখা - সুবন্নখা - সুবর্ণরেখা। শাবরী ভাষায় নেকা নদীবাচক শব্দ। অতীতে হয়তো নদীর নাম ছিল সাবরনেকা (শাবরী নদী)। স্বর্ণস্মৃতি ও সংস্কৃতায়নের ফলে অভিজাত রূপ নিয়েছে।[২] সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চল অনেক সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে বহু জনজাতিই এই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। অন্য দিকে সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চল শস্য-শ্যামলা-বসুন্ধরা। তাই জনজাতি ব্যাতীত অন্য বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যাক্তিরা এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে দেয়।

(জনসংখ্যা) ২০১১ সালে ভারত সরকারের জনগণণা অনুসারে নীচের সারনীতে সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

■ সুবর্ণরেখা অববাহিকা (ঝাড়খন্ড) ১৩,৫৯০ বর্গ কি. মি. ।[৩]

এলাকার পরিচয়		সাধারণ জাতি		তপশিলী জাতি		তপশিলী উপজাতি	
জেলা	ব্লক	পুং	ম.	পুং	ম.	পুং	ম.
১। রাঁচি	১। ওরমানঝি	২৩২৪৮	২৭১৮১	২০৬৩	১৯১১	১৭১০৫	১৬৬২৯
	২। পিসকা	৩৭৪	৩৬৭	৪	৩	১২৪৪	১২৪৩
	৩। সোনাহাতু	২৯৯৮৭	১৬৫৮০	৬১১৫	৩০৯০	৩০২৫	১৮৪৫৫
	৪। বুন্ডু	১১১৪২	১০৩৫৯	১৭০৪	১৬৪৭	১৮৬৮৭	১৮৩৫৫
	৫। তামাড়	৩০৫৯৪	২৯৮৩৮	৭৮৩৭	৭৪৭৮	২৮৬৪২	২৮২৮৩
	৬। রাতু	২০২৪৪	১৯০৩৬	১৩১৮	১২৯১	১৭২২৩	১৭৪৫৩
২। সরাইকেলা খারসোয়ান	১। আদিত্যপুর (গামাহারিয়া)	৪৪৬১৬	৪১১০৭	৪৩৭০	৪৩০৭	২০২৮১	২০০৩৬
	২। চান্ডিল	৫৩১১৪	৪৯৩৩২	৩৮৮৮	৩৮৬৭	২৩৯৯৮	২৩৭৫০
	৩। গোবিন্দপুর (রাজনগর)	৩১০৮৬	৩০৬২০	১৪৪৩	১৪৭৫	৩৫২৮১	৩৬৬৯৫
	৪। সরাইকেলা	১৮২৮৪	১৭৪৭১	২৭৪০	২৮১৮	১৮৯৬৫	১৯২২৯
	৫। খারসোয়ান	২৩৯৩৫	২২৪৮৯	৩৪০৩	৩৪৪৪	১৭৬৬৩	১৭৭০৮
	৬। ইঁচাগড়	২৫৬১৬	২৪৩২২	৩২০৬	৩১৫১	১৩৫৬৯	১৩২৩৫
	৭। নিমডিহি	২৩৪৩৫	২১৭২৯	২০৬৭	১৯৮৬	১৪৮২৫	১৪৫৯৭
	৮। কুচাই	৬৭৫৫	৬৪৭৫	৪৭৫	৪৪৬	২৫২১৩	২৪৯৫৬
	৯। ককরো	৮২৭২	৭৭৭০	৬৬১	৬৩১	১৯৬৫	১২৮৪
৩। সিংভূম (পূর্ব)	১। গোলমুরি (যুগসেলাই)	১২৬৮২৮	১১৪৭৭৭	৫৬৪৫	৫৩৮৩	৫১১৩২	৫১৬০৭
	২। পটকা	৪৪৪০৯	৪২৭২৪	৩৮০৫	৩৯৬৮	৫১৭০৪	৫৩০০২
	৩। পটমদা	২২৮৮০	২২০৪৮	২৪২৬	২৪২১	১৬৬৫৬	২২৮৮০
	৪। বরম	১৮৮৯৫	১৭৭২১	১৬৬৫	১৫৮৫	১৪৫৮২	১৪৫৬৫
	৫। ঘাটশিলা	৩৪৪১৮	৩২৩৫০	৪২২৯	৪২৪৪	২৭২৭১	২৭৩৯৩
	৬। মুসাবনি	২৬৬৫৭	২৪৮৮৭	২৯৭২	২৯৩২	২৪৬২৭	২৫০০৯
	৭। ডুমুরিয়া	৭১৩৪	৬৮৭৬	১৭৩৩	১৭২৭	২২১৭৬	২২৪৮২
	৮। ধলভূম	১৩২৪৪	১২৪৭৪	১২৪৭	১২৮৮	১৬৮১৮	১৬৮৬১
	৯। গুড়াবেন্দা	৩৬৯	৩৫২	৮৭	৯৫	২০২	২০৭
	১০। বহড়াগোড়া	৪৫২২২	৪২৩৯৫	৫২৩০	৫২৩৬	২৭৬৫১	২৭৩১৭
	১১। চাকুলিয়া	২৫২৫৪	২৪৬৫৯	১৫৭৮	২৮১২৮	২৭৬২৫	২৫২৫৪

- **সুবর্ণরেখা অববাহিকা (পশ্চিমবঙ্গ) ২১৬০ বর্গ কি. মি.।**[৪]

এলাকা পরিচয়		সাধারণ জাতি		তপশিলী জাতি		তপশিলী উপজাতি	
জেলা	ব্লক	পুং	ম.	পুং	ম.	পুং	ম.
পশ্চিম মেদিনীপুর	১। গোপীবল্লভপুর - ১	২১৮৬৫	২০১৪৭	১৫০৩৮	১৪৩৮৫	১৮৫৭২	১৮২৪৭
	২। গোপীবল্লভপুর -২	২৪৬৮৬	২৩১৯৫	১৬৪৬১	১৬০৯২	১২৩১২	১২২৫০
	৩। নয়াগ্রাম	২৮৪৭৭	২৭৯৩৬	১৪৪৮৭	১৪৪১২	২৮৫৭৩	২৮৩১৪
	৪। কেশিয়াড়ি	৩২৫৫৬	৩১৩১৬	১৭৩২৩	১৬৯৩৭	২৫৭২২	২৫৪০৬
	৫। দাঁতন	৫৮৭৪২	৫৫৯৪৭	১৪৭৬১	১৪৪৭৪	১৪০৯৮	১৪০৮৫

- **সুবর্ণরেখা অববাহিকা (ওড়িশা) ৩২০১ বর্গ কি. মি.।**[৫]

এলাকা পরিচয়		সাধারণ জাতি		তপশিলী জাতি		তপশিলী উপজাতি	
জেলা	ব্লক	পুং	ম.	পুং	ম.	পুং	ম.
১। ময়ূরভঞ্জ	১। বারিপদা	৮৪১১	৭৮০৫	৯২১	৯২৯	২৬২৫৫	২৫৪৬১
২। বালাশোর	১। জলেশ্বর	৬৩৫৯৭	৫৯৭৪৭	২০৯৫২	২০০৯৩	১৯৯৩১	১৯৭৭০
	২। ভোগরাই	১১৬৪৪৭	১০৭৬৮০	২৬৬২৮	২৫৬৩৮	৩৬২৬	৩৫৬৭
	৩। চন্দ্রবালে	২২৭	২১০	৭৫	৭৮	১৩	১৭

■ সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকা অঞ্চলের জনবিন্যাস ।[৬]

সাধারণ জাতি (General)	তপশিলী জাতি (S.C.)	তপশিলী উপজাতি (S.T.)	অনগ্রসর সম্প্রদায় (O.B.C.)	অন্যান্য সম্প্রদায় (Other class)
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেনে, সদগোপ, মাহিষ্য, করণ, বৈষ্ণব, বৈদ্য, সামন্ত/সাঁথ, বাগাল, আগুরি, শুকলি।	বাগদি, বাউরি, ভুঁইঞ্যা, চামার/মুচি, ধোপা, ডোম, ঘাসি, হাড়ি/মেথর, জালিয়া কৈর্বত্য (কেওট), কোটাল, করঙ্গা/করগা, লোহার, মাল পোদ, ভকত/ভগতা, শুঁড়ি, নমশূদ্র, চাঁড়াল/চন্ডাল ।	সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, কোড়া, শবর, লোধা, খাড়িয়া, বেদিয়া, মাহালি, অসুর।	কুর্মি(কুড়মি), ছুতার, কামার, কুমার, তেলি, নাপিত, যোগী (যুগী), নাথ, গোয়ালা, ময়রা (মোদক), বারুজীবি, তাতি, কাঁসারি, শাঁখারি, রাজু, তাম্বুলি/তামলি, খয়রা, জোলা(আনসারি-মোমিন), তপশিলী জাতির ধর্মান্তরিত খ্রিষ্ঠাম, কাহার/বেহারা, চিত্রকর (পটুয়া) খন্ডায়েত (কদমা)।	মুসলমান, ধর্মান্তরিত- খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, মারওয়ারি, চুনারি / চুনারু।

■ সুবর্ণরেখা নদী অবাহিকা অঞ্চলের জনগোষ্ঠী

১) **<u>সাঁওতাল</u>** ঃ- আলোচ্য ভৌগোলিক এলাকায় প্রায় সর্বত্রই জনগোষ্ঠীর লোকেরা বাস করেন। এরা কৃষিজীবি আবার শিকারও করেন। আদি ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগণা থেকে সুবর্ণরেখা নদী পার্শ্বস্থ অঞ্চলে আগত। সুবর্ণরেখা নদীর উভয় তীরবর্তী রাঁচি, জামশেদপুর, ঘাটশিলা, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, দাঁতন প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমান এদের বসবাস। বনভূমি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, জীবিকা হিসাবে কৃষিতেই এরা ধীরে ধীরে অবস্থান করে এবং নানান জাতীয় ফসল উৎপাদন

করতে থাকে। নতুন নতুন জঙ্গল কেটে ভূমিকে চাষযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এঁদের দক্ষতার পরিচয় আছে । স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সংরক্ষিত উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার পর এদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। লক্ষ্যণীয় এরা পারিভাষিক অর্থে লোকসমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। এদের পদবী হাঁসদা, মুরমু, কিস্কু, বেসরা, হেমরম, বাস্কে, টুডু, মান্ডি, সরেন প্রভৃতি হয়ে থকে। এই শ্রেণীর লোকেদের মাতৃভাষা সাঁওতালি ছাড়াও বাংলা ভাষাভাষী লোকেদের সাথে বাংলায় কথা বলতে দেখা যায়।

২) **ভূমিজ** ঃ- এঁরাও একটি অরণ্যবাসী- জনগোষ্ঠী আলোচ্য ভৌগোলিক এলাকার প্রায় প্রতিটি থানায় এই সম্প্রদায়ের লোকেদের বসবাস। অবশ্য সিংভূম, মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি এলাকায় এই সম্প্রদায়ের লোকেদের বসতির ঘনত্ব অনেক বেশী। কারও মতে এরা ছোটনাগপুরের উপত্যকা ভূমির মুন্ডা গোষ্ঠীরই একটি শাখা। এঁরা গোত্র পরিচয়ে টোটেম পন্থী। ভূস্বামী ভূমিজগণ রাজপুত ক্ষত্রিয় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে সিং পদবী গ্রহণ করেছেন। কথিত আছে, ভূম- রাজ্যগুলিতে এঁরা পাইক নিযুক্ত হতেন এবং সেই সূত্রে সর্দার পদবীও এঁদের মধ্যে প্রচলিত। পাইক বিদ্রোহে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশ নিয়েছিলেন।[৭] ভূমিজ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ - ভূমি থেকে জাত। সুতরাং এঁরা প্রধানতঃ কৃষিজীবি। অনেকেই ভূমিজ ভাষাকে ত্যাগ করে বাংলা ভষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করেছেন, যদিও তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমানে অস্ট্রিক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে, আচার্য সুনীতি কুমার চট্যোপাধ্যায় মনে করেন “পশ্চিম বাংলার ভূমিজ ও লোধা জনগোষ্ঠী সম্ভবত, হিন্দু ধর্ম ও সমতলবাসী মানুষের সংস্পর্শে প্রথম এসেছিলেন।”[৮]

তবে প্রকৃতপক্ষে এরা বর্ণহিন্দু সমাজে পুরোপুরি মিশে যাননি। যেমন মনসা, শীতলা এবং চন্ডীর মতো দেবদেবীর পূজা শুরু করেছিলেন। তেমনি নিজ নিজ উপজাতি গোষ্ঠীগুলির গরাম থান বা বৃক্ষতলবাসিনী রঙ্কিনী দেবীর প্রতি ও সমান শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন। তাছাড়া ব্রহ্মণ্যবাদ ও পুরোহিততন্ত্র এঁদের সমাজে এখনও কর্তৃত্ব স্থাপন করেনি। নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রধান মুখিয়ারাই প্রধানত পুরোহিতের কাজগুলি করে থাকেন। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. বঙ্কিম মাইতি মনে করেন - “আরণ্যক অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর কাছে যা ছিল বড়াম থান, গ্রামবাসী ভূমিজ, লোধাদের কাছে তা হয়ে উঠছে গ্রামের গরাম থান।” আদিম বৃক্ষ পূজা এঁদের হাতে এসে

সৃষ্টরূপ পেয়েছে। পোড়া মাটির হাতি, ঘোড়ার ছলন নিবেদন এঁদেরই কীর্তি। আর্য-অনার্য ধর্ম ভাবনার মিলন সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । এঁদেরই পূজিতা বনচন্ডী রুঙ্কিনী, সপ্তসিনী প্রভৃতি দেবী বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিকতায় আত্মীকৃত হয়ে সীমান্ত খন্ডের কালী, চন্ডী, জয়দূর্গা প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।[৯]

৩) **কোড়া** ঃ- জাতি বিচারে এরা আদি অস্ট্রাল শ্রেণীর আদিবাসী এবং মুন্ডাদেরই এক বিচ্ছিন্ন শাখা। সম্ভবত মাটি কাটার পেশা গ্রহণ করেই তারা মুন্ডা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে মাটি কাটা ছাড়াও চাষি-ক্ষেতমুজুর হিসাবেও তাদের দেখা যায়। অদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের সঙ্গেই তাদের সংযোগ বেশী। ভাষা মুন্ডারী গ্রুপের সাঁওতালির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যযুক্ত। তবে আঞ্চলিক বাংলা ভাষীদের সঙ্গে এরা আঞ্চলিক বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী।

কোড়াদের আদি নিবাস সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায় এরা ছোটনাগপুরের আদি অধিবাসী। জীবিকার প্রয়োজনে এরা মুঙ্গের, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, ধলভূম, মানভূন প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। একটা সময় কোড়ারা ধলো, মালো, শিখরিয়া, সোনারেখা, বাদামিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীতে বিভক্তি ছিল। রিসলে সাহেবের মতে যারা ধলভূম অঞ্চল থেকে এসেছিল তারা ধলো, যারা মানভূম অঞ্চল থেকে এসেছিল তারা মালো।[১০]

৪) **মুন্ডা** ঃ- এরা এখানের আদি অধিবাসী। মূলত কৃষিজীবি ও শিকারজীবি। ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। তবে ভূমিহীনরাও আছে। বর্তমানে কৃষি ছাড়াও নানা পেশায় যুক্ত। পদবী সিং, মুড়া। মাতৃভাষা মুড়া (মুন্ডারি গ্রুপের)। আঞ্চলিক বাংলাভাষীদের সঙ্গে আঞ্চলিক বাংলা ব্যবহারকারী।

৫)) **মাহালি** ঃ- এদের সম্পর্কে রিসলে সাহেব জানাচ্ছেন ঃ "Mahili, Mahali a Dravidian Caste of Labours, palanquin bearers and Wonders in bamboo found in Chota-Nagpur and Western Bengal."[১১] রিসলে সাহেব এদের পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। বাঁশফোড় মাহলি, পাতর মাহালি, সুলংখি (Sulunkhi)মাহালি, তাঁতি মাহালি এবং মাহালি মুন্ডা। মাহালি মুন্ডা বাঁশের জিনিসপত্র তৈরী করত বলে সম্ভবতঃ কোনো এক সময় নিজেদের মুন্ডা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাঁশফোড় মাহালি বাঁশের ঝুড়ি, ঝাঁটা, কুলো ইত্যাদি তৈরী করে, পাতর মাহালিরা বাঁশের ঝুড়ি নির্মাণ ছাড়াও চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। সুলুংখি মাহালিরা চাষবাস এবং দিনমজুরের কাজ করে। তাঁতি মাহালিরা ছিল পাল্কি বাহক।

মাহালিদের ভাষা প্রকৃতপক্ষে মুন্ডারী গ্রুপের। তবে হিন্দু প্রতিবেশে থাকতে থাকতে এদের আচার সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের সমস্ত মাহালিরা তারা নিজস্ব মুন্ডারী ভাষা হারিয়ে বর্তমানে আঞ্চলিক বাংলাভাষী।

৬) **খয়রা** ঃ- রাঢ়ের বাগদি জাতির একটি উপজাতির বিভাগ। এঁরা খয়ের গাছের আঠা থেকে খয়ের প্রস্তুত করত বলে খয়রা বলে অভিহিত হয়।[১২] বগদিদের মতো এঁরাও নদী নালা থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের পদবী রায়, লাড়ু, লাঢ়া, লা প্রভৃতি।

৭) **ডোম** ঃ- সামাজিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেনী। এই জাতির মধ্যে আঁকুড়ে, মাহালি কালিন্দি, কাটারী, খাড়া, ইত্যাদি উপভাগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে আঁকুড়ে উপভাগটিই সবচেয়ে উঁচু। এঁরা ধর্ম ঠাকুরের পূজারী এবং অন্যান্য ডোমদের পৌরোহিত্য করে। এদের পদবী পন্ডিত, হাতি, মাদুলী ইদ্যাদি। ডোম জাতি পাল যুগ পর্যন্তও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। বর্তমানে লোকয়ত ধর্মানুসারী। বৃত্তি বাঁশের ঝুড়ি, ঝাঁটা, কুলো, মাছ ধরার ঘুনি ইত্যাদি নির্মাণ, শব বহন ও চিতা প্রজ্ব্লন। আর এক শ্রেণীর ডোমের পরিচিতি ঢুলি হিসাবে ঢোল বাজানো এদের বৃত্তি ।

৮) **মাহিষ্য** ঃ- সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এঁরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। ১৯০১ এর জনগণণা থেকে হালিয়া কৈবর্ত্যরাই মাহিষ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কৃষিকাজ জীবন-জীবিকার মাধ্যম হলেও এরা অবস্থাপন্ন ও নানা উচ্চপদে চাকুরীরত। সামাজিক দিক দিয়ে এঁদের মধ্যে লালচাটিয়া, একসিধে, দোসিধে এবং মাকুন্দ এই চারটি উপবিভাগ আছে।[১৩] এঁদের মধ্যে লালচাটিয়া থাক বা উপবিভাগের মাহিষ্যগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। বিয়ের ক্ষেত্রে লালচাটিয়া থাকের মাহিষ্যরা লালরঙের মাদুরের উপর বসে। একসিধে থাকের মহিষ্যরা বিয়ের সময় কনের পিতার বাড়ির খাদ্য গ্রহণ করে না। কনের পিতা কোনো এক প্রতিবেশীর বাড়িতে তাদের নিজেদের দ্বারা প্রেরিত (সিধে চাল, ডাল, মাছ, তরিতরকারী ইত্যাদি) রান্না করিয়ে খায়, দোসিধেরা অনুরূপ দুটি সিধে পাঠিয়ে কনের বাপের বাড়িতে নিজেরাই রাঁধিয়ে দুবার অন্ন বা খাদ্য গ্রহণ করে। মাকুন্দ থাকের মাহিষ্যরা কনের বাপের বাড়িতে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য নিয়ে গিয়ে কনের বাপের

বাড়ির লোকজন এবং প্রতিবেশী হালিক চাষিদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করে।

৯) **কুমোর** ঃ- কৌলিক বৃত্তি মাটির হাঁড়ি, কলসী তৈরী হলেও সম্পন্ন শিক্ষিতরা নানা পেশায় যুক্ত। অঞ্চলিক বাংলাভাষী।

১০) **ভুঁইয়্যা** ঃ- সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝোর এরা ভূমিহার, মুশাহার, দেশওয়ালি, নায়েক, খন্ডায়েৎ, ঘাটোয়াল, সর্দার, পূরাণ ইত্যাদি নামে অভিহিত। আবার আসাম পূর্ব বঙ্গের (বাংলাদেশ) বার ভুঁইয়াদের কথাও শোনা যায়। তবে মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ময়ূরভঞ্জের ভুঁইঞ্যারা তপশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত। নায়েক, ভুঁইঞ্যা, দেশওয়ালি ইত্যাদি পদবি এরা ব্যবহার করে। এরা লোকায়ত দেব দেবীর উপাসক এবং এইসব পূজানুষ্ঠান পরিচলনা করে এদের স্ব-জাতীয় পুরোহিত (দেহুরি)। জীবিকা চাষবাস এবং দিনমজুরী। মহিলারা সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে চাকরানির কাজ করে। কেউ কেউ বারবণিতার বৃত্তিতেও যুক্ত। পুরুষদের কিছু অংশ দেশী মদের শুঁড়িখানা পরিচালনা করে। অঞ্চলিক বাংলা ভাষী।

১১) **শবর** ঃ- ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে তাঁর পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ গ্রন্থে জানিয়েছেন - "পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাতেই কেবলমাত্র শবর জাতির আদিবাসিদের দেখা যায়।"[১৪] পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি থানা, ঝাড়গ্রাম মহুকুমার নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর থানা তথা পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শবরদের দেখা যায়। এরা আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত। মুখ্যত ভূমীহীন এবং অরণ্যজাত মূল-কন্দ ভোজী, কৃষি অনায়ত্ত। বর্তমানে বনজ সম্পদ আহরণ করা ছাড়াও শ্রমিক হিসেবে পাথর ভাঙা, মাটি কাটার কাজে যুক্ত। দারিদ্র্য সীমার নীচে এদের অবস্থান। পদবী- শবর, ভক্তা, কোটাল, মল্লিক, ওঝা, দিগার, দন্ডপাট, বাঘ, নায়েক বা লায়েক। আঞ্চলিক বাংলাভাষা ব্যবহারকারী। এঁদের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাগ - শবর, লোধা, খাড়িয়া-শবর। ২০০১ সালের সেনসাসে এই বিভাজন তুলে দিয়ে সবাইকেই শবর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

১২) **অসুর** ঃ- ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদি অধিবাসী। মুন্ডা ঐতিহ্যবাহী এবং অনুমান একসময় মুন্ডাদের দ্বারা আদি বাসভূমি থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছিল। খনিজ লোহা নিস্কাশন এঁদের জাতিবৃত্তি।[১৫]

ঝাড়গ্রামের লোহার এবং চাপুয়া-কামার (যারা চুল্লির আগুনে লোহা গলিয়ে কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং গ্রামীণ মানুষের গৃহস্থালির নানা তৈজসপত্রাদি নির্মান করে) সম্প্রদায় অসুর জাতি ভুক্ত। এঁদের মাতৃভাষা কোল গ্রুপের হলেও, বর্তমানে এরা নিজস্ব - ভাষা হারিয়ে আঞ্চলিক বাংলাভাষী দু একজন প্রাচীন নিজস্ব মাতৃভাষা সম্পর্কে অবহিত হলেও চর্চার (ব্যবহার) অভাবে তাও ভুলতে বসেছে।

১৩) **বেদিয়া** ঃ- Bedia জাতি সম্পর্কে পশুপতি প্রসাদ মাহাত জানাচ্ছেন - "খেরোয়াল জাতি সত্তার কুড়মি গোষ্ঠীর একটি অংশ, যাঁরা বেদিয়া নামে পরিচিত তাঁরা তপশিলী জাতি ভুক্ত। কুড়মি মূল গোষ্ঠী থেকে নানা সামাজিক অত্যাচার 'দেশবাইশই' বা 'গোষ্ঠী পঞ্চায়েত' দ্বারা পতিত বলে চিহ্নিত বা Out Caste হয়েছিলন।তাঁদের জমি-জমা, সম্পত্তি সহ সমস্ত কিছুতেই তাঁরা সমাজ কর্তৃক সামাজিক এক ঘরে হয়ে অভিশপ্ত জীবনযাপন শুরু করে দেশান্তরী হন। সুন্দরবন, নদীয়া চব্বিপরগনা, ঝড়গ্রাম, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, এবং উত্তর বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, মালদহ তথা বাংলাদেশে তাঁরা নতুন জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েন।"[১৬]

এদের সম্পর্কে রিসলে সাহেব জানাচ্ছেন - "এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত কৃষিজীবি শ্রেনী, সম্ভবত কুড়মিদের দৌহিত্র বংশধর, এদের সঙ্গে কুড়মিদের এক সময় বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, কিন্তু যখন জানতে পারা যায় যে এরা গোমাংস ভোজী, অথবা কুড়মিরা যবে থেকে গোমাংস ভোজন ত্যাগ করলো- তবে থেকে এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রহিত হল।[১৭] রিসলে সাহেব অরো জানাচ্ছেন - The Twelveth Sept of the Santals, which is purpposed to have been left behind in champa, and has long been separated from the parent Tribe, bears the name of Bedia, and it seems not improbable that the Bedias of Chotonagpur may be actually a branch of the Santals who did not follow the main tribe in their wanderings East wond. The connection of the Bedias with the Kurmis tells rather for this view.[১৮]

পক্ষান্তরে Beduya যাযাবর গোষ্ঠী বছরের বিভিন্ন সময় একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায়। মাঠের মাঝে পলিথিনের তাঁবু খাঁটিয়ে বসবাস করে। কাক পাখি মেরে খাওয়া, সাপ খেলানো, ছোট খাটো ভেলকিবাজী দেখানো, জড়ি-বুটির চিকিৎসা করে জীবন ধারণ করে। ভাষা বাংলা মিশ্রিত ভোজপুরী।

১৪) **হাড়ি** ঃ- রাঢ়ের অনুন্নত জাতিগুলির অন্যতম। এদের অর্থনৈতিক মান খুব নিম্ন । বৃত্তি অনুযায়ী এদের নানা থাক বা উপভাগ আছে। যেমন - ১.ভুঁইমালি বা চাষী, ২. ধাই বা ফুল হাড়ি, ৩. কাহার বা পালকি বাহক, ৪. মেথর, ৫. কদমা। মধ্যযুগে সামন্ত রাজাদের হাতি - ঘোড়া পরিচর্যাও এরা করত। এদের মধ্যে প্রচলিত পদবী - বিশুই, সর্দার, সিং, বাগ, মাঝি, দুয়ারি, বক্সা, রানা, মুখী ইত্যাদি। এরাও একসময় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে এসেছিল - কালের প্রবাহে আজ এরা লোকায়ত ধর্মের অনুসারী। শব দাহ করে। এদের সমাজে পুনর্বিবাহ বা সাঙ্গা প্রচলিত।

১৫) **চন্ডাল / চাঁড়াল** ঃ- অনুন্নত শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এদের দেহে ২২% দ্রাবিড় রক্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ যুগে এরা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ছিল এবং অনেকই তান্ত্রিক যেগে সিদ্ধ ছিল। এদের অনেকেই এখনো তন্ত্র-মন্ত্রে বিশেষ সিদ্ধ।[১৯] তবে কালের পরিবর্তনে অধিকাংশই আজ কৃষি শ্রমিক-মজুর। এদের কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের মতো উপবীত ধারণ করে।

১৬) **খন্ডায়েত** ঃ- উড়িষ্যা ও উড়িষ্যা সন্নিহিত মেদিনীপুরে এদের দেখা যায়। একসময়ে এদের পরিচিতি ছিল সেনা হিসেবে। স্থানীয় সামন্তরাজের আমলে এঁরা ভূস্বামীদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিত। বর্তমানে এঁরা চাষবাস এবং মাছ ধরা ছাড়াও নানান বৃত্তি এবং জীবিকায় নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে। মন্ত্রী, মুদুলি, নায়েক, দাস ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করে। আঞ্চলিক বাংলা ভাষী।

১৭) **করগা/করঙ্গা/পাথুরিয়া** ঃ- "পশ্চিমবঙ্গের করগা বা করঙ্গাদের রিসলে সহেব দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এঁরা দুটি পর্বে বিভক্ত। একটি পর্বের কূলতিলক (totem) শালগাছ। অপরটি কচ্ছপ। এছাড়াও অঞ্চল ভেদে এঁরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত - ঢালুয়া, মালুয়া, শিঘরিয়া এবং তুঙ্গ।"[২০] এঁরা বাঁশের ঝুড়ি, কাঠের পুতুল, গরুর গাড়ির চাকা ইত্যাদি, পাথর কেটে নানা মূর্তি এবং তৈজসপত্রাদি নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কেউ আবার কূপ খননের কাজেও যুক্ত। ঝাড়গ্রামের করগারা পাথুরিয়া নামে পরিচিত।

১৮) **কদমা** ঃ- "চাষবাস, মাছধরা, চুন তৈরী ও বেচা এবং দিনমজুরী এদের জীবিকা। উড়িষ্যার খন্ডায়েতদেরেই একটি শাখা।(totemistic section) এঁরা।"[২১] আঞ্চলিক বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী। পারিবারিক পদবী ভুঁইয়া, দাস, দোলুই, জানা ও পাত্র, এদেরপাঁচটি উপশাখা, কালিন্দি বৈষ্ণব, মাদলবাজা, শঙ্খবাজা, মাছুয়া ও চন্ডালি। ওডিশার কান্ড্রাদের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এদের মিল দেখা যায়। বালেশ্বরে সম্ভবত এই দুই শাখা একই সম্প্রদায় গোষ্ঠী এবং স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় এঁরা ওড়িয়া থেকে আগত উপজাত গোষ্ঠী।[২২]।

১৯) **ঘাসি** ঃ- হান্টার সাহেব এদের জীবিকা চাষবাস এবং দিনমজুরী বলে জানিয়েছেন।[২৩] কিন্তু ঝাড়গ্রামের ঘাসি সম্প্রদায় জমিদারের ঝাড়ুদার (সুইপার) বৃত্তিতেও যুক্ত। তপশিলী জাতি হিসেবে চিহ্নিত। চাকরি সূত্রে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে এদের অভিগমন ঘটেছে। রিসলে সাহেব এদের ছোটনাগপুর এবং মধ্য ভারতের মৎস্যজীবি ও কৃষিজীবি দ্রাবিড় সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছেন। আরো অভিমত - The ghasis of Chotonagpur are divided into three sub caste Sonata, Simarloka and Hart. They have only one section (Kasiar) probably a corrupationof Kasyapa.[২৪] সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে এরা অন্ত্যজ, শ্রেণীভুক্ত। পারিবারিক জীবনও অত্যন্ত বিশৃঙ্খলপূর্ণ নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ঝড়গ্রামের ঘাসি আঞ্চলিক বাংলা ব্যবহারকারী। তবে জন্ম মৃত্যু-বিবাহ সংক্রান্ত আচার-সংস্কারে এরা এখনো পুরানো ঐতিহ্যবাহী এবং তা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির অনুরূপ। "এঁর মতে এরা চন্ডাল শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত - ঘাস কাটা যাদের বৃত্তি।"[২৫]

২০) **পোদ (পুন্ড্র)** ঃ- মৎস্যজীবি, কৃষিজীবি জাতি, সামাজিক অবস্থান নিচু। অধিকাংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। বাল্যবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ এদের সমাজে প্রচলিত।, রিসলে সাহেবের মতে - "পোদরা চারটি উপভাগে বিভক্ত - Bangande, Bangle, khotta বা Mauna এবং Oriya, Uraiya (উড়িয়া)।[২৬] উড়িষ্যার বালেশ্বর এবং মেদিনীপুর জেলায় কেন্দ্রীভূত।"[২৭] সম্ভবত উড়িষ্যা থেকেই এদের আগমন ঘটেছে।

২১) **বাউরি** ঃ- "উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত বাউরি জাতির আদিম বাসভূমি হাজারিবাগ। পরবর্তীকালে উহারা মানভূম, শিখরভূম, ধলভুমে ছড়াইয়া পড়ে।"[২৮] অবশ্য

বর্তমানে এরা তপশিলী জাতি ভূক্ত। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় রাঢ়ের বাউরিদের মধ্যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আলপাইন গোষ্ঠীর শোণিত যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হয়েছে। জাতিগত বৃত্তি পাল্‌কি বা ডুলি বহন। কিন্তু আধুনিক যুগে পাল্‌কি বা ডুলির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যওয়ায় এঁরা কৃষি-শ্রমিক, মজুর বা অন্যান্য দৈহিক শ্রম জীবিকায় নিজেদের যুক্ত করেছে। এরা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এদের একই গোষ্ঠী বা গোত্রে বিবাহ প্রচলিত। বাল্য বিবাহ প্রচলিত। বর কনে উভয় পক্ষের মুখিয়া বা মোড়ল বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। পুনর্বিবাহ বা সাঙ্গা প্রচলিত। শব দাহ করে।রাঢ়ের জাতি-সংস্কৃতির গবেষক মানিকলাল সিংহের অভিমত- "মহাযান বৌদ্ধদের সময় হইতেই----- রাঢ়ের বাউরি, হাড়ি, মুচি, ডোম, কেওট, বাগদি, মাঝি, নায়েক, খয়রা, মাল ইত্যাদি জাতি গোষ্ঠীগুলি বৌদ্ধতন্ত্রের আওতায় আসিয়া পড়ে এবং উহাকেই তাহাদের আপন ধর্ম বলিয়া মানিয়া লয়।"[২৯]

২২) **বাগদি** ঃ খালে বিলে মাছধরা এদের আদিম পেশা হলেও দুর্ধর্ষ সহসী জাতি বলে একসময় বাগদি পুরুষেরা স্থানীয় সামন্ত রাজাদের বা সম্পন্ন ভূ-স্বামীদের সম্পত্তি রক্ষক লাঠিয়ালেরকাজ করতো। বর্তমানে শিক্ষিত বাগদিরা নানা পেশায় যুক্ত। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, "বাগদিদের মধ্যে ৩০% দ্রাবিড় শোণিত প্রবাহিত।"[৩০] বাগদিদের মধ্যে রাউৎ, লাঢ়া, লাড়ু, প্রতিহার, দিগর, সর্দার ইত্যাদি পদবী প্রচলিত। এদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হলে নারী - পুরুষের সাঙ্গা বা পুনর্বিবাহ প্রচলিত। এঁরা শব দাহ করে। আঞ্চলিক বাংলা ভাষী ।

২৩) **মেটে/মেইটা** ঃ- বাগদি জাতির আন্যতম উপবিভাগ। মধ্যযুগে এদের কিছু অংশ সামন্ত রাজাদের ঘাটোয়াল এবং সৈন্য বিভাগে কাজ করতো। মল্লযোদ্ধা হিসাবেও এদের খ্যাতি ছিল। এদের প্রচলিত পদবী সাঁতরা, বাঘ, পোড়েল, দিগর, পাল, কোটাল ইত্যাদি।

২৪) **মাঝি** ঃ- রাঢ়ের আদিম মৎস্য শিকারী গোষ্ঠীগুলির অন্যতম বাগদি জাতির উপভাগ। বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে বাগদি জাতি থেকে পৃথক হয়ে দুটি স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিগণিত হয়েছে - মাঝি ও দন্ডমাঝি। বাগ্‌দি জাতির এই দুটি শাখা দাঁড় টেনে, লগি বা বৈঠা ঠেলে খেয়া পারাপার করে বলেই এরা বাগ্‌দি মাঝি এবং দন্ড মাঝি নামে অভিহিত। এই দুই সম্প্রদায়ের বিবাহে আদিবাসীদের মতো মহুল বিয়ে

(প্রথম বর-কনের মহুয়া গাছের সঙ্গে বিয়ে) প্রচলিত। স্বগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ, বিবাহ বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ বা সাঙ্গার প্রচলন আছে। শব দাহ করা হয়। কালীপূজার দিন পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক বাংলা ভাষী।

২৫) **বারুজীবি / বারুই** ঃ- পান চাষ এদের বৃত্তি। তবে বর্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে অন্যান্য পেশাতেও নিজেদের যুক্ত করেছে। এদের আবার তিনটি সামাজিক থাক বা শ্রেনী আছে। গৌতম, গৌউর, রূপ-সনাতন।[৩১] যার থেকে অনুমান করা যায় এক সময় এঁরা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মে। এদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় অন্তর্বিবাহ এবং উত্তর ভরতীয় বহির্বিবাহ দুই প্রচলিত আছে।

২৬) **বাগাল** ঃ- প্রায় সমগ্র সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে এরা ছড়িয়ে আছে। অবয়বিক গঠন এবং সংস্কৃতিতে এরা আরণ্যক আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সম পর্যায়ভুক্ত। শিক্ষা, আর্থিক ক্ষেত্রে সমাজে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেনী। গরু চরানো তথা রাখালি এদের মূল বৃত্তি হলেও এর পাশাপাশি অরণ্যজাত দ্রব্য সংগ্রহ এবং বিক্রয়, কৃষি মজুর, সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহ ভৃত্য (ভেতুয়া / ভাতুয়া), গরু ছাগল রক্ষণাবেক্ষণ করেও এরা জীবিকা নির্বাহ করে। নব জাতকের জন্মের নয় দিনের মাথায় এদের নখ কাটে (নখতা) ইত্যাদি জাতি শৌচ এবং নামকরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুন্ডাদের মতো দু ধরনের নামকরণ হয় - একটি পুত্র সন্তানের নামকরণ হয় ঠাকুরদা (মিতা)-র নমানুসারে ও কন্যা সন্তানের নামকরণ হয় ঠাকুমা (মিতিন)-র নামানুসারে ও অন্য নাম হয় উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে। মাতৃদেহ সৎকারে দাহ, কবর বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া এদের মধ্যে আছে। তবে বর্তমানে দাহ-র চলই বেশি। বিবাহ অনুষ্ঠানেও আদিবাসী লোকাচার বর্তমন। তবে বর্তমানে এদের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারকারী। বাগাল, গোয়ালা, রাউৎ, খিলাড়ী, গোপ, ঘোষ, মাল, নায়েক, মাহাকুড়, আহির ইত্যাদি পদবী এরা ব্যবহার করে।

২৭) **ভকত / ভগত / ভগতা** ঃ- মেদিনীপুরের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। এদের দাবী, সাতাশ পুরুষ আগে এরা এই জেলায় এসে বসবাস করে। ঝাড়গ্রামের এলাকায় ভকতেরা পরিচিত ছিল সামন্তরাজাদের লাঠিয়াল হিসাবে। আজ অবধি লাঠিই এদের শক্তির কেন্দ্র। সামাজিক ও ধর্মীয় আচার আচরণে এরা হিন্দুধর্মানুসারী।

বর্তমানে নানা জীবিকায় যুক্ত। "সম্ভবতঃ এরা দ্রাবিড় জাতির উপাশাখা। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না।"[৩২]। আঞ্চলিক বাংলা ভাষী।

২৮) **ধোপা** ঃ- সম্পন্ন গৃহস্থের জামা-কাপড় ধোয়া এবং প্রয়োজনে ইস্ত্রি করা এদের জীবিকা, এছাড়াও জন্মশৌচ, মৃত্যুশৌচ ইত্যাদিতে বর্ণ-হিন্দুদের জামা কাপড় কেচে শুদ্ধ করে দেওয়াও এদের কাজ। তবে বর্তমানে কৌলিক বৃত্তির বাইরে এদের অনেকেই সরকারি, আধা-সরকারি বা ব্যাবসা বাণিজ্যে যুক্ত। এদের পদবী শীট, রজক ইত্যাদি।

২৯) **তাঁতি** ঃ- জীবিকা তাঁত বোনা। হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই জীবিকায় যুক্ত। তবে বর্তমানে মিলের কাপড়ের চাহিদা ও যোগান বেশি হওয়ায় স্ব-বৃত্তির পাশাপাশি দিন মজুরী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশায় নিজেদেরকে যুক্ত করেছে।

৩০) **কুড়মি** ঃ- সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়খন্ডে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এতদ্ এলাকায় এক উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী - যারা এখানে আঞ্চলিক ভাষা - সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং সমৃদ্ধ করেছে। জাতিগতভাবে এরা আদিবাসী (সাঁওতাল) কৌমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অন্বিত। সাঁওতালদের সঙ্গে এদের চল-বিচল এবং কনের বাড়িতে বরের বাড়ির হলুদ তেল নিয়ে যায় সাঁওতাল সম্প্রদায়েরই কেউ।

৩১) **শুঁড়ি** ঃ- কৌলিক বৃত্তি দেশিমদ প্রস্তুত ও তার ব্যবসা হলেও তপশিলী জাতিভুক্ত এই সম্প্রদায় বর্তমানে কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে অধিকাংশই সরকারি, আধা-সরকারি চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত, অন্যান্য ব্যবসায়তেও যুক্ত।

৩২) **ছুতার** ঃ- কাঠের তৈজস পত্র, মন্দিরের দরজা, ঘরের দরজা-জানালা, লাঙ্গল-মই, গরুর গাড়ির চাকা ইত্যাদি প্রস্তুতকারক। সমাজে এদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় একটি ক্ষেত্রে- সেটি ছুতার বাড়ির ঢেঁকি ভানা (কোটানো) চিড়ে ছাড়া দেবতার ভোগ হবে না।

৩৩) **কাহার** ঃ- একসময় এঁরা সম্পন্ন ধনীদের এবং স্থানীয় সামন্ত রাজাদের পাল্‌কি বাহকের কাজ করতো। কিন্তু পাল্‌কির দিন শেষ হওয়াতে বর্তমানে ক্ষেত মজুর বা দিন মজুরের কাজ করে অন্ন সংস্থান করে।

৩৪) **বেহারা** ঃ- কাহার জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি শ্রেণী । একসময় অভিজাতদের পাল্‌কি বহন কারা ছিল এদের বৃত্তি। বর্তমানে নানা পেশায় যুক্ত। আঞ্চলিক বাংলা ভাষি।

৩৫) **চুনারি / চুনারু** ঃ- যখন কৃত্রিম চুন আবিস্কার হয়নি তখন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই - অঞ্চলেও বেশ কিছু মানুষ চুনাপাথর এবং শামুক, গুগলি, ঝিনুক-শাঁখ পুড়িয়ে চুন উৎপাদনের বৃত্তিতে যুক্ত ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় এই বৃত্তি জীবীরা আজ অন্য বৃত্তিতে নিজেদের নিয়োগ করেছ্নে। দু-চারটি পরিবার আছে যারা পান খবার কলিচুনটুকুই আজ প্রস্তুত করে।

৩৬) **গোয়ালা-গোপ** ঃ- বৃত্তি গো-পালন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয়। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে আহির বা আভীর দু ধরনের গোপ জাতিই দেখা যায়। “রাঢ়ের অভ্যন্তরে পল্লব গোপদেরেই আধিক্য দেখা যায়। এঁরা মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারত হইতে উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে রাঢ়ের উপকন্ঠে এবং রাঢ়ের অভ্যন্তরে বসবাস করতে থাকেন। রাঢ় এবং দন্ডভূক্তির সুবিস্তৃত নিবিড় অরণ্যের অভ্যন্তরে একদা ছোটো ছোটো পল্লব গোপ পল্লীগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। এদের প্রধান দুটি পদবী ঘোষ এবং মন্ডল।”[৩৩]

৩৭) **রাজু** ঃ- ওডিশা এবং মেদিনীপুরেই এদের সংখ্যাধিক্য। রাজানুগ্রহে জমি লাভ করে এরা পশ্চিম রাঢ়ে বসবাস শুরু করে। পেশা চাষ-আবাদ, একসময় এদের কারো কারো জমিদারিও ছিল। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান হিন্দুদের মতই । পারিবারিক পদবী ঘোষ, পাল, দত্ত, জানা, প্রধান, মহান্তি ইত্যাদি। । এদের দুটি উপশাখা ঃ দৈন্য বা ডাঁয়া এবং বায়ান বা বাঁয়া। দৈনরা বায়ানদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করে। উভয় শাখারই দাবি তারা ওডিশার সঙ্গ সম্রাট অনন্তবর্মা চোলগঙ্গের বংশধর।[৩৪] আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলে।

৩৮) **কাঁসারি** ঃ- কাঁসা-পিতলের তৈজস-পত্রাদি প্রস্তুতকারী এবং বিক্রয়কারী বেনিয়াদেরই একটি শাখা এরা। বংশ বনিক নামেও পরিচিত।

৩৯) **শাঁখারি** ঃ- শাঁখারি বা শঙ্খবণিক জাতি রাঢ়ের বণিক জাতিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। শাঁখারিরা একাধারে শিল্পী এবং বনিক। শাঁখ থেকে শাঁখের বালা, পদক, আংটি, কানফুল, গলার মালা ইত্যাদি শিল্প দ্রব্যগুলি যোমন এরা নির্মাণ করে, তেমনি আবার দেশ দেশান্তরে রপ্তানিও করে। দত্ত, নন্দী, কর, সেন, ভদ্র, নায়ক, নাগ, শূর, হাজরা, কুন্ডু, নানা পদবী দেখা যায় এদের ।

৪০) **আগুরি** ঃ- মর্যাদা সম্পন্ন মিশ্র জাতি। জীবিকা কৃষি হলেও বর্তমানে নানা পেশায় যুক্ত এরা। আঞ্চলিক বাংলা ভাষী।

৪১) **মোদক / ময়রা** ঃ- জীবিকা মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়। জন্ম-মৃত্যু বিয়ের আচার-সংস্কার বর্ণ হিন্দুদের মতোই। আঞ্চলিক বাংলা ভাষী।

৪২) **শুকলি** ঃ- ঝাড়গ্রাম মহকুমার দক্ষিণাংশে বসবাসকারী অন্যতম গোষ্ঠী। এরা অখন্ড মেদিনীপুর জেলার ক্ষুদ্র চাষী সম্প্রদায়। সোলাঙ্কি রাজপুত বীরসিংহের বংশধর বলে এরা নিজেদের দাবী করে। "বীরসিংহ প্রায় ছশ বছর আগে মেদিনীপুরে এসেছিলেন ও কেদার কুন্ডু পরগণার বীরসিংহপুরে একটি গড় তৈরি করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে"[৩৫] এদের তিনটি উপশাখা - বড় ভইয়া, বাহাওরঘরি ও দশাসই। বড় ভাইরা তিন উপশাখার ভেতরে সবচয়ে সন্মানিত। রীতিনীতিতে হিন্দু সমাজের অনুশাসন মেনে চলে। সামাজিক দিক দিয়ে পোদ ও ধোপাদের সমগোত্রীয়। ধর্মে বেশির ভাগই বৈষ্ণব। কৃষিই প্রধান উপজীবিকা।

৪৩) **কৈবর্ত্য / কেওট** ঃ- মেদিনীপুরের উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী। বিশিষ্ট চাষি এবং নদীকেন্দ্রিক মৎস্য শিকারী জাতি। মেয়েরা সুতো কাটে আর পুরুষেরা সেই সুতোয় জাল বুনে মাছ ধরে। মেদিনীপুরের এক উল্লেখযোগ্য প্রচীন জাতি এই কৈবর্ত্যরা। গ্রিয়ার্সনের মতে উড়িষ্যা এদের আদি নিবাস। বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠান উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মতোই। এদের মধ্যে দুটি উপবিভাগ আছে - জালিয়া ও হালিয়া। **১৯০১** এর জনগনানা থেকে হালিয়া বা চাষিরা মাহিষ্য হিসাবে পরিচিত। মাছ ধরা এদের

বৃত্তি। এঁরা ধীবর, দন্ডপাট, লায়েক ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করে। রিসলের মতে এঁরা উপজাতি ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী ভুক্ত।

৪৪) **সামন্ত / সাঁথ** ঃ- এঁরা নিজেদের একদা স্থানীয় সামন্ত রাজাদের বংশধর বলে দাবী করে। এদের আর্থনীতির মূল উৎস কৃষি, অধিকাংশই কৃষিজমির মালিক। তবে সুশৃঙ্খল জীবনাচরণের অভাবে অনেকেই বর্তমানে দিনমজুরীতে যুক্ত। মহিলারা সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে। সামাজিক আচার - সংস্কার বর্ন হিন্দুদের মতোই। আঞ্চলিক বাংলা ভাষা।

৪৫) **নাপিত** ঃ- কৌলিক বৃত্তি ক্ষৌর কর্ম। কিন্তু বর্তমানে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের সদস্যরা সরকারি, বেসরকারি নানা উচ্চপদে চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত। কেউ বা ভিন্ন ব্যবসায় যুক্ত। মুর্দন্যা শর্মা, পারামানিক, প্রামানিক, বারিক দাস ইত্যাদি পদবী ব্যবহার কারী।[৩৬]

৪৬) **কামার** ঃ- কৌলিক বৃত্তি লোহার জিনিসপত্র তৈরি। তবে অন্যান্যদের মতো এরাও আর কেবলমাত্র নিজেদের কৌলিক বৃত্তিতে বাঁধা নয়। এতদ্ অঞ্চলে দুই দেশীয় কামার - উৎকল এবং রাঢ়ীয়দেরই দেখা যায়। উৎকলীয়রা (ময়ূরভঞ্জ) রানা পদবী ব্যবহার করে। এঁরা Lost Wax পদ্ধতিতে পিতলের নানা দ্রব্য তৈরি করে। রাঢ়ীয় অঞ্চলের কামাররা তামা, পিতল, কাঁসার তৈজসপত্র তৈরি করে। এছাড়াও আছে চাপুয়া-কামার, যারা লোহার কৃষি যন্ত্রপাতি ও গৃহস্থালির তৈজসে তৈরি করে।

৪৭) **তেলি / তিলি** ঃ- এদের কৌলিক বৃত্তি উদ্ভিদ বীজ থেকে তৈল নিস্কাশন। তৈল নিস্কাশনের যন্ত্র ঘানা এবং ঘানির ব্যবহার অনুসারে এদের মধ্যে শ্রেনী বিভাজন আছে। যারা ঘনার সাহায্যে তৈল নিস্কাশন করে, মনে করা হয় তারা দক্ষিণ ভারত থেকে এদেশে এসেছেন। আর যারা ঘানির সাহায্যে তৈল নিস্কাশন করেন না, তাঁরা এসছে উত্তর ভারত থেকে। এই দুই শ্রেণীর তেলিদের মধ্যে সমস্ত রকম সামাজিক আদান প্রদান নিষিদ্ধ। তবে বর্তমানে এই নিয়ম শিথিল হয়েছে নিজস্ব বৃত্তির বাইরে এরা নানা পেশায় ছড়িয়ে পড়েছে।

আবার "রাঢ়ের তেলী জাতির মধ্যে পদ-পদবীর প্রচলন ছিল না। কুলু অথবা গরাই এই দুটি জাতি নামেই উহারা আপনাদের পরিচয় দিতেন। পরবর্তীকালে উঁহাদের মধ্যে স্বল্প কয়েকটি পদ পদবীর উদ্ভব ঘটে।"[৩৭] গরাই , সাউ, মাল, সাধুখাঁ,

ঘান, কুন্ডু, নন্দী, মন্ড, চৌধুরি, ধর, পাত্র, প্রামানিক, মান্না, দাস ইত্যাদি পদবী এরা ব্যবহার করে।

৪৮) **তাম্বুলি / তামলি** ঃ- রাঢ়-তাম্রলিপ্তের বারুজীবী বা বারুইরা পান (তাম্বুল) উৎপাদন কারী। আর তাম্বুলি বা তামলিরা তাম্বুল (পান) ব্যবসায়ী। কোনো কোনো পন্ডিতের অভিমত দক্ষিণ-কলিঙ্গের তামিল জাতি থেকেই এ বঙ্গের তামুলি বা তামলি জাতির উদ্ভব। বর্তমানে এঁরা কৌলিক বৃত্তির বাইরে নানা পেশায় যুক্ত। দে, দত্ত, কর, পাল, সেন, নন্দী, রক্ষিত, সিংহ, লাহা, হালদার, কুন্ডু, দাঁ, নাগ, নানা পদবী ব্যবহারকারী।

৪৯) **বৈদ্য** ঃ- এদের কৌলিক বৃত্তি চিকিৎসা করা। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আজ আর এঁরা কেবলমাত্র নিজেদের বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়- চাষবাস (ভু-সম্পত্তির মালিকানা), সরকারী বেসরকারি চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদিতে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গীয় উভয় শ্রেণীর বৈদ্যরই বসতি এখানে।

৫০) **কায়স্থ** ঃ- ব্রিটিশ জমিদার কোম্পানীর আমলে ঝাড়গ্রামের এদের আসার সূত্রপাত। সেই সূত্রে কেউ খাজনা আদায়, হিসাব রাখা ইত্যাদি উচ্চপদে জমিদার কোম্পানীতে চাকরী নিয়েছে। কেউ বা প্রভূত ভূ-সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেছে। বর্তমানে এ বাংলা, ওপার বাংলা এবং উৎকল দেশীয় কায়স্থই এখানে আছেন - যারা সরকারি-বেসরকারি চাকরি বা ব্যবসাতে যুক্ত।

৫১) **মারওয়ারি** ঃ- এখানে এদের আগমন মোঘল ও ব্রিটিশ শাসনকালে বণিক হিসাবে। তবে এরা সংখ্যায় খুব সামান্য। মূলত ঝাড়খন্ডে এদের ব্যবসা ও বসতি। এদের পদবী আগরওয়াল, পাটোয়ারী প্রভৃতি।

৫২) **যুগী** ঃ- এঁরা শৈব ধর্মী। এদের প্রচলিত পদবী নাথ, দেবনাথ, পন্ডিত, দাস। এরাও একসময় বৌদ্ধ ছিল। সমাজের পশ্চাদপদ জাতি দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। যুগীরা পুতুল নাচিয়ে, কাঁচের চুড়ি, মাথার ফিতে ইত্যাদি মনোহারী দ্রব্য হাটে - মেলায়, বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের যুগীরা ভিক্ষাজীবি হলেও এদের কয়েক জন শিক্ষিত হয়ে শিক্ষকতার মত নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত।[৩৮] এঁরা শব দাহ না করে সমাধিস্থ করে।

৫৩) **পটুয়া / চিত্রকর** ঃ- সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী সাঁকরাইল ব্লকের মুরুনিয়া গ্রামের পটুয়ারা ধর্মে হিন্দুমুসলমান দুই আছে। পদবী ব্যবহার করে চিত্রকর, পটিদার পূর্বে কাপড়ের পটে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হত। বর্তমানে কৃত্রিম রঙ - ওয়াটার কালার ব্যবহার করে কাপড়ের পরিবর্তিতে আর্ট পেপারে। এঁরা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

৫৪) **মুসলমান** ঃ- এঁরা সম্ভবত ধর্মান্তরিত হয়ে বিহার প্রদেশ থেকে এই অঞ্চলে এসেছিল। তাই নিজ পরিবারের মধ্যে বিহারী খোট্টা / খেট্টি (হিন্দু-উর্দুর মিশ্রণ) ভাষা ব্যবহার কারী এবং বাইরে আঞ্চলিক বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী ।

৫৫) **মাহাতো** ঃ- দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় অরণ্য অঞ্চলের এক বৃহওর জনগোষ্ঠী এই মাহাতোরা। এঁরা বাংলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা ছাড়িয়ে আর সমতলের দিকে এগোননি। এঁরাও ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। বর্তমানে ঝাড়খণ্ড মানভূম, সিংভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা অঞ্চল ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ কেওনঝোর অঞ্চলে প্রধানত বসবাস করেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এঁদের মধ্যে ক্ষত্রিয় মর্যাদার দাবীতে প্রবল হয়ে ওঠে, তখন থেকে এঁরা নিজেদের 'কুর্মীক্ষত্রিয়' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। ১৯৩১ সালে জন-গণণায় এঁরা উপজাতি তালিকা থেকে বাদ পড়েন। এঁদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় কৌতুহল সৃষ্টি করে। ভাষার ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায় আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও বহু ক্ষেত্রে এরা অস্ট্রিক জনগোষ্টীরই নিকট সম্পর্কিত জন। এঁরা আরণ্যক এলাকায় আবশ্যই বর্ধিষ্ণু ও অভিজাত। এঁদের মাহাতোই একমাত্র পদবী। এদের গরাম থান সাধারনতঃ গ্রামে প্রবেশ পথের কোনো গাছের তলায়। তাছাড়া এঁদের গরাম থানে অখোদিত পাথর খন্ডের সাথে পোড়ামাটির হাতি ঘোড়ার ছলন মানত হিসাবে নিবেদিত হয়।ইদানিং এঁদের বিবাহে ও শ্রাদ্ধে পুরোহিত ও মন্ত্র তন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। হয়তো বা অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধি ও প্রতিবেশী বর্ণহিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রভাব এক্ষেত্রে থাকতে পারে। তবে ঐতিহ্যবাহী উৎসব পালনে এঁদের আগ্রহ সমান বজায় রয়েছে। আর সেক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যের কোনরকম ব্যাতিক্রম ঘটা সম্ভব নয়।

গ্রাম বাংলার বিশেষ করে এই পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় লোকায়ত সংস্কৃতিতে এই সম্প্রদায়ের দান সবচেয়ে বেশি। এঁদের মধ্যে নৃত্য, গীত-প্রীতি অধিক। করম - বাঁধনা প্রভৃতি লোকোৎসবের পাশাপাশি এঁরা ভাদু - টুসু প্রভৃতি কৃষিভিত্তিক উৎসবও

পালন করেন। এইসব উৎসব-আঙ্গিক লোকসংগীত ও ঝুমুরগান প্রধানত মাহাতো সম্প্রদায়েরই রচনা। এদের ব্যবহৃত ভাষাকে নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা 'কুড়ুমালি বাংলা' বলতে চান। লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. বঙ্কিম মাইতির মতে "এঁদের কথ্যভাষা মানভুঁইঞ্যা বা পশ্চিম প্রান্তিক রাঢ়ী বাংলা। কুর্মীমাহাতোদের ব্যবহৃত ভাষা বলে তা 'কুড়ুমালি বাংলা' নামে পরিচিত। টুসু, করম গানের ভাষা এই মানভুঁইঞ্যা বাংলা, বাঁধনা পরবের গানগুলির ভাষা অবশ্য মাগধী মৈথিলী খোট্টাই বাংলা বলে পন্ডিতজনের অভিমত।"[৩৯] নাচ গান এঁদের ও উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এঁদের মেয়েরা অবশ্য দাঁড়া বা পাঁতা মাচে অংশ নেন না।

৫৬) **করণ** ঃ- বঙ্গজ কায়স্থদের সমশ্রেণীর বলে করণ সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। উড়িষ্যায় ও মেদিনীপুরের উড়িষ্যা সীমান্তবর্তী থানাগুলিতে এদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। এলাকার কয়েকটি রাজপরিবার করণ সম্প্রদায়ের ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৎস্যজীবি হিসেবে এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের কৌলিক পদবীগুলি সেই উত্তরাধিকারের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মাইতি, মহান্তি, পট্টনায়েক, মহাপাত্র, পাত্র, জানা, রাউৎ ইত্যাদি সাধারণত করণ সম্প্রদায়ের পদবী হয়ে থাকে। বিবাহ, মৃতের সৎকার ও অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে এঁরা উৎকলীয় আচার অনুসারী। গমা পূর্ণিমায় (রাখি পূর্নিমা) জামাইকে অভ্যর্থনার রীতি মেনে চলেন। ইদানিং বঙ্গীয় রীতিতে জামাই ষষ্ঠীর প্রচলন অবশ্য দেখাও যায়। এই সম্প্রদায় স্থানীয় ক্ষেত্রে ওড়িয়া করণ হিসেবে উল্লিখিত হয়ে থাকেন।

৫৭) **সদগোপ** ঃ- গোপালক সম্প্রদায়ের যাঁরা কৃষি জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেন, তাঁদের 'সদগোপ' আখ্যা দেওয়ার অর্থ হল সৎ-চাষী। সুবর্ণরেখার তীরবর্তী অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ বাস করেন। পাল, ঘোষ, ভুঁইঞ্যা, পাত্র, মহাপাত্র ইত্যাদি এঁদের পদবী। এঁরা আর্য ব্যবস্থার বৈশ্য রূপে পরিচিত। উৎকলীয় ব্রাহ্মণেরা এঁদের পূজা পার্বণ পালন করে থাকেন। এঁদের পারিবারের মধ্যে উভয় ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এই অঞ্চল গুলিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার থকা সত্বেও শিবদেবতার মন্দির প্রায় প্রতি গ্রামে রয়েছে। শিবের গাজনে এই সম্প্রদায়ের লোকেদের পাঠভক্তা হওয়ার অধিকার রয়েছে। পারিবারিক আচার-আচরণে এদের এক অংশ বঙ্গীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের আচার-বিচার মেনে চলেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে এবং কার্ত্তিক মাসে পয়া অমাবস্যায় পিতৃপুরুষের অর্পণ ও

পিন্ড দান আবশ্যিক ভাবে করে থাকেন। বনবাসী জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠজন হিসেবে তপশীলি জাতিভূক্ত জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করার কারণ তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধের স্বরুপ। তাদের বাসস্থান প্রাকৃতিক কারণে নানা সমস্যায় ভরা। উচ্চবর্ণের প্রতি তাদের নিরাশক্তি, এবং জীবনযাত্রার পারস্পরিক প্রয়োজনের সূত্রে পরস্পরকে নিকটজন করে তুলেছে। তাই এইসব উল্লিখিত তপশীলি জাতি ভুক্ত গোষ্টীগুলি আরণ্যক সম্প্রদায়গুলো পরস্পর আপনজন করে তুলেছে। তাদের চাষের কাজে এঁরা সহয়ক, অরন্যসম্পদ সংগ্রহে এঁরা পরস্পরের সহায়। দৈনন্দিন সামাজিক জীবনেও এদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। জীবন ধারনের বাস্তব প্রয়োজনে পরস্পরের নৈকট্য হয়েছে। তেমনি আপন আপন সম্প্রদায়গত আচার আচরণ তারা নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পাদন করে। ফলে একত্র বাসস্থান সত্বেও এদের মধ্যে বিরোধের ঘটনা ঘটে না। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম সব তপশীল ভূক্ত জাতিগুলিকে একদা আকৃষ্ট করেছিল। চৈতন্য দেব এর চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ - মনে এদের প্রাণে বাঁচার প্রেরণা যুগিয়ে ছিল। এর ফলে এদের কৌলিক পদবীরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তবে বৈষ্ণব গুঢ়তত্ব বোধহয়, এদের অন্তরে স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারেনি। ফলে শাক্ত আচার এঁরা ত্যাগ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে সমাজ জীবনে এঁরা বর্ণহিন্দু সমাজে অনুসারী, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও এদের ভূমিকা প্রায় অনুরূপ।

বর্তমানে এই সব অঞ্চলে উচ্চবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠী বসবাস ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে। হয়ত বা বংশ পরম্পরায় এখানকার আধিবাসীরা বুদ্ধিবলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা সূত্রে এখানকার বাসস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেননি। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, করণ, সদগোপ, রাজু, মাহিষ্য সম্প্রদায়ই প্রধান। এর পাশাপাশি এদের সামাজিক ও পারিবারিক আচার বিচার পালনের সূত্রে নাপিত, ধোপা, মালী ইত্যাদি জাতির পরিবারও বসবাস করে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই জনবিন্যাসে শেষোক্ত গোষ্ঠীর দু-একঘর অধিবাসী দেখা যায়। এরা মুখ্যতঃ বর্ণহিন্দুদের বাড়ির কাজকর্মে অংশ নেয়। অবশ্য ধোপা, নাপিত, মালি বা মালাকারেরা কোনো কোনো সময় বিত্তবান বনবাসীজনের আনুষ্ঠানেও যোগ দেন। এখানে পাশাপাশি বসবাসের সূত্রে পারস্পারিক সমন্ধেও ভাবধারা দুর্লক্ষ্য নয়।

৫৮) **ব্রাহ্মণ** ঃ- উড়িষ্যা সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে উৎকলীয় ও ব্যাসোক্ত - এই দুই শ্রেণীর অবস্থান দেখা যায়। মাহিষ্য

সম্প্রদায়ের মধ্যে যজন যাজনে ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণদের প্রধান্য। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা অন্ত্যজ গোষ্ঠীর পূজা পার্বণ করেন, তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ে পরিত্যজ্য বা পতিত রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। গাজন-উৎসবে ভক্তদের ভোগ ভাসানোর সময় যারা অংশ নেন, তাঁদের ধামী ব্রাহ্মণ বলা হয়। এঁরাও ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত বলে পরিচিত। পঙ্‌ক্তি ভোগ, বিবাহাদির ক্ষেত্রে এদের এড়িয়ে চলার বিষয়টি নজরে পড়ে। উৎকলীয় ব্রাহ্মণদের সংখ্যা এখানে বেশী। হয়ত বা দীর্ঘকাল উৎকলীয় শাসকদের শাসনাধীন এলাকায় বসবাসে উৎকলীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যাপ্তি এই অঞ্চলে ঘটেছে। এঁরা কৌলিক বিচারে মিতাক্ষরা রীতি মেনে চলেন। করণ, রাজু, সদগোপ, সম্প্রদায়ের পূজা অর্চনা এরাই সম্পাদন করে থাকেন। সামাজিক পরিবর্তনে ব্রাহ্মণেরা চাষ-আবাদ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই উৎকলীয় ব্রাহ্মণেরা নিজেদের 'দক্ষিণী বৈদিক' রূপে পরিচিতি দিয়ে থাকেন। পন্ডা, মিশ্র, দ্বিবেদী, ত্রিপাঠী, ষড়ঙ্গী, পানিগ্রাহী, চক্রবর্তী ইত্যাদি সাধারনতঃ এদের কৌলিক পদবী। 'দাশ' পদবীও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'দাস' পদবী থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে, বানানে 'স' এর বদলে 'শ' লিখে থাকেন।[৪০] এঁরা যে উৎকল দেশাগত, তা প্রমাণ মেলে এদের পরিবারে এবং সম্প্রদায়ের মধ্য ওড়িয়া ভাষা ব্যবহারের নিরিখে। তাছাড়া দেব পূজায় এরা বাংলা হরফে ওড়িয়া ভাষার লেখা ব্রতকথা বা পূজা পদ্ধতির বই বা খাতা ব্যবহার করে থাকেন এরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লেখা পড়ায় অগ্রণী এবং দেব পূজার অধিকারী। বিবেচনায় সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকেন।

এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার

ক) সুবর্ণরেখা নদীঅববাহিকার ভৌগোলিক পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে।
ঝড়খন্ডের রাঁচী জেলার অন্তর্গত হুড়ু জলপ্রপাত থেকে এই নদীর উৎপত্তি। বর্তমানে তিনটি রাজ্যের সীমানাবরাবর প্রবাহিত। প্রবাহপথে যেসব এলাকার উল্লেখ রয়েছে তা হল - রাঁচী, খারসোয়ান-সরাইকেলা, পূর্বসিংভূম প্রভৃতি ঝাড়খন্ডের জেলা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ ও বালাশোর, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর।
খ) ভারতের জনগণণা ২০১১ অনুযায়ী ঝড়খন্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ - এই তিনটি রজ্যের ছটি জেলার জাতিভিত্তিক (সাধারণ, তপশিলী জাতি ও উপজাতি) পুরুষ ও মহিলার অনুপাত উল্লেখিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে।

গ) এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এলাকার জনগোষ্ঠীর জাতিভিত্তিক নামের তালিকা সম্পর্কে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতির আরো কিছু কিছু উপশ্রেণীগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ জনবিন্যাসের কথা।

ঘ) এলাকার মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও বিশ্বাস-সংস্কারের কথা বিস্তারিত আকারে আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জিঃ-

১। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা); সঞ্চয়ন পত্রিকা (দ্বিতীয় প্রয়াস), বাংলা বিভাগ, ভট্টর কলেজ, দাঁতন, পঃ মেদিনীপূর, মার্চ ২০০৭, পৃ-৭।

২। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা); সঞ্চয়ন পত্রিকা (দ্বিতীয় প্রয়াস), বাংলা বিভাগ, ভট্টর কলেজ, দাঁতন, পঃ মেদিনীপূর, মার্চ ২০০৭, পৃ-৮।

৩। Report in census of India 2011 (জনগণণা ২০১১) ঝাড়খন্ড রাজ্যের জেলা ভিত্তিকতথ্য।

৪। Report in census of India 2011 (জনগণণা ২০১১) পঃ মেদিনীপুর জেলার ব্লক ভিত্তিক তথ্য।

৫। Report in census of India 2011 (জনগণণা ২০১১) ওডিশা রাজ্যের জেলা ভিত্তিকতথ্য।

৬। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী/তপশিলী জাতি ভূক্ত ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বই কেনা/মাধ্যমিক পরীক্ষার ফী ও আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের আবশ্যিক দেয় ফী এর জন্য সরকারী বৃত্তির আবেদন পত্র, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, পঃ মেদিনীপুর পঃ বঃ সরকার।

৭। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -১২।

৮।মিশ্র যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -১৩।

৯। মাইতি বঙ্কিম কুমার; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, পৃ - ১১৭।

১০। H.H. Risley; The tribes and castes of Bengal Vol – I. Firma KLM, PH – 1998.

১১। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal Vol – II P-40. Firma KLM, PH – 1998, I ibid.

১২। ঘোষাল ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ মেদিনীপুর পঃ বঃ সরকার, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-৩৯।

১৩। ঘোষাল ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ মেদিনীপুর পঃ বঃ সরকার, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-৪৪।

১৪. বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ; পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, (১ম. খন্ড) ১৯৯৯ সংস্করণ, পরিবেষক - সুবর্ণরেখা, পৃ - ৭৭।

১৫। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal Vol – I, P-25, Ibid.

১৬। মাহাত পশুপতি প্রসাদ; ঝড়খন্ডের হড়মিতাং (খেরওয়াল সামজিক সভ্যতা, শিল্প চেতনা ও জীবনরসবোধ পৃ-১৪, প্রশিক, দূর্গানগর রবীন্দ্র পল্লী কোলকাতা - ২০০১)।

১৭। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal, Vol – I. Firma KLM, P-85 Ibid.

১৮। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal, Vol – I. Firma KLM, P-83 Ibid.

১৯। ঘোষাল ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধূসদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলি-৬৮, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-৩৭।

২০। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal, Vol – I. Firma KLM, P-426 Ibid.

২১। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal, Vol – I. Firma KLM, P-367 Ibid.

২২। দাশ বিনোদ শঙ্কর ; মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, সাহিত্যলোক, ১৯৮৯, পৃ - ৭১।

২৩। W.W. Hunter ; A statical account of Bengal, Vol –III, stastical account of Midnapur P- 57.

২৪। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal, Vol – I. Firma KLM, P-227-238 Ibid.

২৫। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal, Vol – I. Firma KLM, P-185

Ibid.

২৬। ঘোষাল ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধূসদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলি-৬৮, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-৩৯।

২৭। H.H. Risley ; The tribes and castes of Bengal, Vol – II. Firma KLM, P-176

Ibid.

২৮। সিংহ মানিকলাল; রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খন্ড) পৃ - ১৪৯।

২৯। সিংহ মানিকলাল; রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খন্ড) পৃ - ১৫৯।

৩০। সিংহ মানিকলাল; রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খন্ড) পৃ - ২২২।

৩১। ঘোষাল, ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধূসদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলি-৬৮, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-৪০।

৩২। দাশ বিনোদ শঙ্কর; মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, (১ম খন্ড), সাহিত্যলোক, ১৯৮৯, পৃ - ৭০।

৩৩। সিংহ মানিকলাল; রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য় খন্ড), পৃ - ১,২।

৩৪। ঘোষাল ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধূসদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলি-৬৮, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-৪২।

৩৫। দাশ বিনোদ শঙ্কর; মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, (১ম খন্ড), সাহিত্যলোক, ১৯৮৯, পৃ - ৭২।

৩৬। ঘোষাল ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধূসদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলি-৬৮, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-৪৪।

৩৭।সিংহ মানিকলাল; রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য় খন্ড) পৃ - ৭২, ১৯৮২, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

৩৮। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা, ১২/০২/২০১৩, তথ্য দাতা ভবানী রাউৎ টোপগেড়িয়া, গোপী-১, পঃ মেদিনীপুর।

৩৯। মাইতি বঙ্কিম কুমার; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, পৃ - ৪৭।

৪০। মিশ্র যতীন্দ্র নাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -১৫।

।।দ্বিতীয় অধ্যায়।।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে জনজাতি-সংস্কৃতির বিবর্তন।

জনজাতি সংস্কৃতির কথা আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই ‘জন’ কথাটি বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। “মনে রাখা দরকার ‘জন’ শব্দটি একটি পরিভাষিক শব্দ। জনসমাজ বা জনগোষ্ঠীতে ‘জন’ শব্দটির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সাধারণ গ্রামীণ কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীই এর অন্তর্গত।”[১] এদের অধিকাংশই নিরক্ষর অথবা অল্প-স্বল্প অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশগত কারণে অথবা জীবিকার প্রয়োজনে এরা গোষ্ঠীগত সংহত সমাজের অধিকারী। এই ধরনের জনগোষ্ঠী অবশ্যই আদিম সমাজের স্তর অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু নাগরিক সমাজের থেকে দূরত্ব রেখে চলে। আবার উন্নতির কারণে ঐতিহ্যে বিশ্বাসী।[২] সাধারণভাবে এই ধরনের সমাজের সৃষ্ট সংস্কৃতি হলো জনজাতি-সংস্কৃতি। এই বিশেষ সমাজের সংস্কৃতির রূপও লালন ক্ষেত্র অভিজাত সংস্কৃতির ধার ধারে না। আবার এই ধবনের সংস্কৃতির মাঝে মাঝে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষ বাঁচার প্রেরণায় পশুপালন করে। মাঠে ফসল ফলায়, বনে কাঠ কাটে, নিরাপদ স্থানে প্রয়োজনে ঘর বাঁধে, নদীতে মাছ ধরে, পশু শিকার করে, আরও কত কী কাজ করে তারা। এসব কিছু তাদের বাঁচার জন্য প্রয়োজনের কাজ। এর পাশাপাশি চলে চিরন্তন সৃষ্টির কাজও। এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে এই সব সমাজের সংস্কৃতি। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

নদীর তীরে পলিমিশ্রিত উর্বর ভূমিতে কিছু অংশ বনভূমি। এই বনভূমিতে শাল, মহুল, কেন্দু মূল্যবান বৃক্ষ, যা মূল্যবান কাঠের যোগান দেয়। কোথাও কোথাও এই অরণ্য বন্য পশুকূলের স্বাভাবিক বাসভূমি। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বনভুমির অংশ কমতে শুরু করেছে। মুল্যবান পুরানো গাছ প্রায় হারিয়ে গেছে। তবে পুরানো গাছের মূল থেকে গজিয়ে ওঠা চারাগাছের অরণ্য তখনকার বনভুমির স্মৃতি বহন করে। বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে নতুন করে বনসৃজনের ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া বনভুমিকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। বেশ কিছু বছর ধরে খদ্যের সন্ধানে দলমা হাতির দল প্রায়ই এই অঞ্চলে কিছুকাল ধরে দাপিয়ে বেড়ায়।

নদীর নিম্ন অববাহিকার বেশিরভাগ অঞ্চল উর্বর কৃষিজমি।[৩] ধান, পাট, আখ ও নানাজাতীয় ডালশস্য, তৈলবীজ শীত ও গ্রীষ্কের নানান শকসব্জি চাষ হয়ে থাকে। এখানকার বেশ কিছু আদিবাসী কৃষির উপর নির্ভর করে সংসার চালিয়ে থাকে। তবে সভ্যতার অগ্রগতি ও নাগরিক সংস্কৃতির আকর্ষণে কৃষি পূর্বের মহিমা হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষিত লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী যোগাড় করতে আবশ্যিকভাবে শহরবাসী হয়ে পড়েছেন। ফলে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে চাষের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাসবাস চালু হয়নি। নিম্ন অববাহিকা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জামশেদপুর ব্যতীত চান্ডিল, ঘাটশিলা, জামশোলা, বহড়াগোড়া, নয়াগ্রাম, দাঁতন, গোপীবল্লভপুর ও জলেশ্বরের মতো গঞ্জ ছাড়া বড়ো

শহর নেই। উৎপন্ন কৃষিজ ফসল নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিক্রয় হয়। এই কৃষকেরা ঐ সমস্ত কেন্দ্রে তাদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে থাকে। এই ভাবেই অর্থনীতির ধারা প্রবাহিত।

সুবর্ণরেখা নদী ঝাড়খন্ডের ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত রাঁচী জেলার হুড্রু জলপ্রপাত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদীটি মূলত মালভূমি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হলেও সারা বছর নদীখাতে জল থাকে। গ্রীষ্মকালেও নদীর জলে স্রোত থাকে। বর্ষার প্লাবনে উভয় তীরবর্তী এলাকাগুলি প্লাবিত হয়। তখন নদীর জল গেরুয়া বর্ণ ধারণ করে।অনেক জনজাতি এই নদীতে মাছ ধরাকে বেছে নিয়ে নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রেখেছে।

এ এলাকার জনগোষ্ঠী মূলত কৃষিজীবি। এক বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ নদীকে কেন্দ্র করে জীবননির্বাহ করে থাকে। উৎসব অনুষ্ঠানে নদীর পবিত্র জল ব্যবহার করে থাকে। মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টির আয়োজন নদীতীরে পূণ্যকর্ম এবং মোক্ষলাভের প্রশস্থ পথ বলে এখনো সমাদৃত।[৪] বহু উৎসব অনুষ্ঠান নদীর তীরবর্তী স্হানে মেলার মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিশেষ করে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পঞ্চকব্রত পালন করে থাকে। মকরসংক্রান্তি পুন্যলগ্নে নদীস্নান পুণ্য কর্ম বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখের প্রথম দিনে নদীবক্ষে পর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান অধিবাসীদের পবিত্র কর্তব্য রূপে প্রচলিত। এমন একটি ভৌগোলিক এলাকা নির্ধারণের পেছনে এই এলাকার লাল কাঁকুরে মাটি, নদীর উভয় তীরে লতা গুল্ম গাছপালার অবস্হান এলাকার পরিবেশকে এক আলাদা মর্যাদা এনে দেয়। এমন পরিবেশের কারণে ও এখানকার অধিবাসীরা পুরুষ পরম্পরায় ঐতিহ্য বিশ্বাসী হতে বাধ্য।[৫] অবশ্য দিনে দিনে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে এলাকার অরণ্য অঞ্চল ধীরে ধীরে কৃষির উপযোগী হয়ে চরিত্র বদলাতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য সংস্কৃতির প্রকৃতিই হল সময়ের সাথে সাথে নিজেকে বদলে নেওয়া।

নদীর উভয় তীরবর্তী এলাকাগুলি কিছুদিন আগেও জনবিরল ছিল। কিন্তু জনবিস্ফোরনের কারণে ও স্বাধীনতার পরবর্তী কালে সরকারের নানা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনার ফলে এলাকাগুলিতে বসবাসের জন্য লোকসমাগম যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে প্রধানত যোগাযোগের যে অসুবিধা ছিল তার যথেস্ট উন্নতি ঘটেছে সরকার ঘোষিত তপশীলভুক্ত জাতি-উপজাতির বসবাস এই এলাকাগুলিতে। এখন যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চবর্ণের অধিবাসীদের আগমন ঘটেছে এলাকাগুলিতে। বিভিন্ন সময়ে কাজকর্ম - উপলক্ষ্যে যারা এলাকাগুলিতে এসেছেন নির্দষ্ট কাজের শেষে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানেই বসবাস করে থেকে গিয়েছেন। ফলে এলাকাগুলোতে একই সাথে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের পাশাপাশি বসবাস করতে দেখা যায়। বেশ কিছুদিন নানা এলাকার সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সংকট দেখা দিলেও এই এলাকায় এমন কোনোও সমস্যা কখনোও ঘটেনি। এই সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতি এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যেতে পারে। এই সুত্রে মনে হয় প্রাকৃতিক নিজস্বতায় এই এলাকার অরণ্য যেমন আপনা আপনি গজিয়ে উঠেছে, নদী খেয়াল খুশিমত ধারাপথ পরিবর্তন করে চলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ব হারায়নি। এলাকার মনুষজনও তেমনি নানা বিভেদ থাকা সত্বেও মিলেমিশে এক সাথে বসবাস করে চলেছে। কোনো অসুবিধা হয়নি। এলাকার প্রকৃতির মতো মানুষজনও কোনোও কিছুকে হারাতে চায় না। কাউকে ছাড়তে চায় না। ফলে পরমতসহিষ্ণুতা এলাকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা যায়।[৬] এক্ষেত্রে চৈতন্য মহপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রভাব থাকার কথা অস্বীকার যায় না।

এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর গোত্রবিচারে কিছু অংশ আরণ্যক জাতি রুপে পরিচিত।[৭] মাহাত, কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, লোধা, বাগাল প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষের বাস এই অঞ্চলে। এদের অরণ্য নির্ভর জীবনযাত্রা, স্বদেশপ্রীতি সামান্য কৃষি আয়ে সাবলীল ভাবে পুরুষ পরম্পরায় জীবন নির্বাহে এই এলাকার ভূমিপুত্র রুপে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। অবশ্য যোগাযোগের উন্নতি, আধুনিক সভ্যতার দুরন্ত অগ্রগতি, বিশেষ করে সরকারি উন্নয়ন, প্রকল্প রুপায়ণ এদের প্রাচীন জীবনযাত্রার মানের বদল ঘটিয়েছে। তা সত্বেও উৎসব অনুষ্ঠান, বিশ্বাস সংস্কারে পূর্বযুগের অনুসরণের মান এখনও বর্তমান। গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম থানা এলাকায়, জলেশ্বরের বিস্তীর্ণ এলাকায় টুসু পরব, করম পূজা, নল সংক্রান্তি প্রভৃতি দিনগুলি আড়ম্বর পূর্বক পালন ও পারস্পারিক সম্প্রীতির বিনিময়ে এলাকায় আদিম জনগোষ্ঠীর প্রভাব স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া রয়েছে হিন্দু সমাজে নিম্ববর্ণ বলে কথিত- হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগদি, বাগাল, নমশূদ্র প্রভৃতি গোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠী। বোধ হয় এরা বহুপূর্ব থেকেই এলাকায় বসবাস করে আসছেন। বনবাসী আরন্যক জনগোষ্ঠীর সাথে এদের সম্পর্কও বেশ ভালো। হয়ত সমতলভূমিতে উচ্চবর্ণের অবহেলা এদের পরস্পরকে নিকট সম্বন্ধে যুক্ত করে তুলেছে। বোধহয় পরবর্তী কলে এলাকায় এসছেন উচ্চবর্ণের লোকেরা। এরা উচ্চবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন - উৎকল - ব্রাহ্মণ, সদগোপ, রাজু, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতিভুক্ত লোকেরা। শিক্ষা-দীক্ষা ও ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে সমাজের নেতৃত্ব এদের হাতেই রয়েছে। সামাজিক মর্যাদা ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ভাবেই এঁরা এগিয়ে আছেন ভারতীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের ফলে কোনো সমস্যা ঘটেনি। বর্তমানে আরণ্যক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষারও প্রসার ঘটেছে। তবে সংখ্যাটা এখনোও যথেষ্ট কম। বেশ বড় অংশের আরণ্যক জনগোষ্ঠীরা বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে থাকে যা দিন মজুরী করে জীবকা নির্বাহ করে থাকেন। কিছু জন খাস জমির পাট্টা পেলেও তা প্রয়োজনের আপেক্ষায় খুবই সামান্য।[৮] অনেকে আবার তাও রক্ষা করতে পারেনি।

মনে হয় এলাকার উর্বর মৃত্তিকা, অরণ্যের সহজলভ্য গৃহনির্মাণের কাঠের যোগান নদীর মাছের সরবরাহ সহজ শ্রমজীবি মানুষদের আনুগত্য উচ্চবর্ণের সম্প্রদায়গুলিকে পরবর্তী কালে স্বাগত জানিয়েছে। উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতিগত আচার-আচরণ বিশ্বাস অনুসরণ করলেও ভূমিপুত্রদের দেব দেবীর উৎসব অনুষ্ঠানে সাগ্রহে যোগদান করে থাকে। ফলে বেশ কিছুকাল থেকেই এক মিশ্র সম্প্রদায় বা জাতি গোষ্ঠীর বাসভূমি এই এলাকা। পরিবেশের শান্তমহিমা এই এলাকার জনজীবনের সহিষ্ণুতা আদর্শ ক্ষেত্রবলে বিবেচিত। হয়তো আরণ্যক জীবনযাত্রার উত্তরাধিকার বংশানুক্রমে এদের আমলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকার বা উপনিষদীয় বাণী 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছে।[৯]

সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতি বিবর্তনের ধারায় রাজনৈতিক প্রভাব এক উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে জনজাতিরাই ছিল আদিম বাসিন্দা। পরবর্তীকালে এই সমস্ত ভূমিপুত্রদের তাড়িয়ে আর্যদের বর্নহিন্দুরা নিজেদের সংস্কৃতির প্রাধান্য ঘটিয়েছে।

সুবর্ণরেখা অববাহিকার বিস্তীর্ন অঞ্চল দীর্ঘকাল উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যা বাসীর কাছে মাদলাপঞ্জী অনুসারে পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুরের দক্ষিণে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাকা দন্ডভূক্তির অন্তর্গত ও উৎকলবাসী গঙ্গ রাজাদের শাসিত ক্ষেত্র।[১০] পাঠান সুলতানের সাথে যুদ্ধ করেই এই ভূভাগ তারা অধিকার করেছিলেন। নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত রাইবনিয়াতে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ উড়িষ্যার রাজাদের স্মৃতি বহন করে। উড়িষ্যার ইতিহাস অনুসার রাইবনিয়ার দুর্গ উড়িষ্যার রাজাদের উত্তর সীমার এলাকা রক্ষা করার কেন্দ্ররূপে নির্মিত। ইংরেজ শাসনের কালে এই দুর্গ তার গুরুত্ব হারিয়ে অব্যবহৃত থাকায় বর্তমানে ধ্বংসস্তুপে পরিনত হয়েছে।

উড়িষ্যার রাজাদের শাসনাধীন থাকার ফলে এখানকার জনগোষ্ঠীর উপর উড়িষ্যার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এখানকার বিশেষতঃ নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের ভাষায় ও জীবনযাত্রায় উড়িয়া প্রভাব অদ্যাপি লক্ষ্য করা যায়। পুরীর জগন্নাথ দেবের মহিমা যেমন উড়িষ্যার সংস্কৃতির এক শক্তিশালী পরিচালিকা, এ অঞ্চলে তার প্রভাব অদ্যাবধি রক্ষিত। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্যে আরণ্যক জাতিগুলি কিছুটা সংকুচিত হলেও দারুব্রহ্মের দারু সরবরাহকারী হিসাবে শবর সম্প্রদায় এক মর্যাদার আসন পেয়ে থাকে। এমন কথাও প্রচারিত, আদিতে দেবতা শবর পূজিত ছিলেন। তার ধারা অদ্যাপি দারু পরিবর্তন কালে মান্য হয়ে আসছে। এসব কিংবদন্তি এ অঞ্চল গুলিতে ও প্রচলিত রয়েছে। সরাসরি জগন্নাথ দেবের মাহিমার বদলে চৈতন্য সংস্কৃতি এ অঞ্চলের মানুষের মানসিক আশ্রয়।[১১]

বঙ্গদেশের অবতার পুরুষ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে সারাভারতে প্রেম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই ধর্মমত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত। সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অচন্ডাল ব্রাহ্মণকে হরিনাম কীর্ত্তনের মহিমা প্রচারে, নিম্নবর্ণের মানুষ সামাজিক মহিমা লাভ করেছিল। সপ্তদশ শতকে বৃন্দাবনে ষড় গোস্বামীগণের দুত হিসেবে শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় চৈতন্য ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার মন্ত্রশিষ্য রসিকানন্দ গোপীবল্লভপুরে শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলে বৈষ্ণব মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা দিলেন।[১২] কেশিয়াড়ীতে অবস্থিত গোড়ীয় মঠ চৈতন্য আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। শ্রী চৈতন্যদেব বিভিন্ন সময়ে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বলা যায় তিনিই প্রথম নিম্নবর্ণের ও উচ্চবর্ণের ভেদাভেদ দূর করতে পেরেছিলেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পঠ পরিবর্তনে যেমন চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী জনজাতিদের মধ্যে প্রচার করে তাদের সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানে যথেষ্ঠ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত এই নদী অববাহিকা অঞ্চলটিও ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও এতদ্ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সনাতনী সংস্কৃতির উপর তেমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সম্প্রতি একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির দখলে চলে যায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূভাগ। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খন্ডের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এদের প্রাধান্য বেশি পায়। কিছু সময় ধরে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত সরকারী হস্তক্ষেপে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ফলস্বরূপ সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এতদ্ সত্ত্বেও জনজাতি-সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যগত ঐক্যের সূত্রে অপরিবর্তিত থেকেছে।

এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ঃ

ক। এলাকার মানুষের সামাজিক অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের রুজি রোজগারের উপর সুবর্ণরেখা নদীকেন্দ্রিক অবাবাহিকা অঞ্চল কতখানি নির্ভরশীল তার রূপরেখা টানার চেষ্টা করেছি।

খ। সমাজ ব্যবস্থার সাথে আর্থিক অবস্থার মেলবন্ধন ঘটনোর চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

গ। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার তথ্যভিত্তিতে বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -৯।

২। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষনা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -১০।

৩। ব্যাক্তিগত সমীক্ষা মার্চ ২০১৪, তথ্যদাতা- বিপ্লব ঘোষ, করতনালা, বহড়াগোড়া, ঝাড়খন্ড।

৪। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -৬।

৫। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -৩।

৬। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -৩।

৭। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -৪।

৮। ব্যাক্তিগত সমীক্ষা ১৪/০৮/২০১২, তথ্যদাতা- রমেশ সাউ, আড়াডাংরী, গোপী - ২ পঃ মেদিনীপুর।

৯। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -৬১।

১০। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -২৩।

১১। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), পৃ -২৪।

১২। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১২/০৩/২০১১ তথ্যদাতা- পবন খামরী, গোপী - ১, পঃ মেদিনীপুর।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতি ও তার সামগ্রিক পরিচয়

সুবর্ণরৈখিক অঞ্চলের মানুষের জীবনের সংস্কৃতি এখানকার মেলা পূজাপার্বণ, ব্রতানুষ্ঠানকে ঘিরে আবর্তিত। অত্যাধুনিক যুগে যেখানে পূজাপার্বণ ও ব্রতানুষ্ঠান অবহেলিত, সেখানে এই অঞ্চলের মানুষ অদ্যাবধি এগুলিকে রক্ষা করে চলেছে। মেলা মানুষের মিলনক্ষেত্র একথা সর্বজনবিদিত। আধুনিক যুগের মেলায় সেই মিলনক্ষেত্র হৃদয় বিনিময়ের বদলে ব্যাবসাটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলে আজও মেলার মধ্যে ব্যবসাকে গৌণ করে দেখে মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয় বিনিময়ই মূল লক্ষ্য। মেলা, পূজাপার্বণ , ব্রতানুষ্ঠানগুলিকে ঘিরে এ অঞ্চলের মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কারের সঙ্গে আদিম ও অনাবিল আনন্দটি লক্ষ্যণীয় বিষয়।

সনাতন ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলাদেশের সমাজ জীবনে লোকাচার মানুষের জীবনকে দীর্ঘকাল ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। “এই অঞ্চলের মানুষের আষ্টেপৃষ্টে ও সেই লোকাচারের বেড়ি।[১]” লোকাচার, পুরানো বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে জাত বলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জীবন চর্চাও সেই বিশ্বাস ও সংস্কারকে খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারেনি। আইখান, বেকড়াপড়া, নলপুজা, অমাবস্যা, ভাইফোঁটা, নবান্ন, ক্ষণই পূজা, বাণমারা, অশুভ শূন্য কলসী, ভূত প্রেতে বিশ্বাস, মা বাবার অভিশাপে বিশ্বাস প্রভৃতি লোকাচার ও বিশ্বাস এখানকার মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর থেকে বাইরে আসার প্রবণতা যেমন মানুষের মধ্যে দুর্লক্ষ্য তেমনি এ অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষদের পর্যন্ত এর কাছে সংস্কার বশে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন ।এর থেকে বুঝি লোকাচার ও লোকবিশ্বাস কী দারুন বন্ধনে এ অঞ্চলের মানুষকে অদ্যাবধি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

সমাজ সচেতন মানুষের শিল্পবোধ একটা সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি। গুহাবাসী অরণ্যবাসী মানুষেরও শিল্প চেতনার নিদর্শন পাওয়া গেছে। “এ অঞ্চলের মানুষ গৃহনির্মাণ শিল্প, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, পুতুল, শিল্প, পটশিল্প, শোলাশিল্প, বড়ি শিল্প, আলপনা, ঝুড়ি বোনা প্রভৃতির দ্বারা মনন, সৌন্দর্যবোধ ও জীবনচর্যার পরিচয় বহন করে চলেছে।[২]” সৌন্দর্যবোধের পরিচয় সকল শিল্পে বিবৃত হলেও মানুষ সামাজিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শিল্প কর্মে আধুনিক রূপের ছোঁয়া লাগছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে তারা কখনো ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হন না। এর দ্বারা পুরাতন ধারার প্রতি তাঁদের যেমন মমত্ববোধ প্রকাশিত, অন্যদিকে শিল্পের আদিরূপকে অস্বীকার না করা অর্থাৎ পুরাতনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্পবোধ ভিন্ন এই অঞ্চলের মানুষের মনে খেলাধূলার অঙ্গসঞ্চালন মূলক লোকশিল্পের ধারা লক্ষণীয়। খেলাধূলার মাধ্যমে লৌকিক ও পৌরাণিক জীবনকে মানুষ বিষয় হিসেবে এখানে গ্রহণ করেন। এছাড়া পৌরানিক কাহিনির আদলে লৌকিক জীবনকে তাঁরা অভিনয়ের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করে লোকায়ত জীবনকেই মূর্ত করে তোলেন।

সাধারণভাবে মানুষের পরিচয় তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, খাদ্যাভাস, অবসর বিনোদন, কথাবার্তায় পাওয়া যায়, তাকেই আমরা সংস্কৃতি বলতে পারি। পারিভাষিক অর্থে বিশ্বভুবনে মানুষের করা বা গড়া যা কিছু, তাই তার সংস্কৃতি। অভিমতটি যথার্থ। চোখে দেখা এই জগতে প্রকৃতির গড়া বহু কিছু আমাদের নজরে আছে। এতে বাতাস, ঝড়-বৃষ্টি, প্রাকৃতিক নানা অবস্থাও অন্তর্ভূক্ত। এর বাইরে মানুষ তার বসবাসের জন্য ঘর বানিয়েছে নানান আকারে, নানান উপাদানে। জীবনদায়ী বর্ষার জল খাল-বিল-নদী-নালায় প্রবাহিত হয়ে ভূভাগ ও ভূগর্ভে সঞ্চিত থাকে। মানুষ পুকুর, কুঁয়া, নলকূপের সাহায্যে তাকে নিজেদের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে। শুধু খাওয়া শোয়া জন্ম মৃত্যুতেই মানুষের পরিচয় নয়, সে জ্ঞান চর্চা করেছে, শিল্পচর্চা করেছে, অবসর বিনোদনের নানা উপায় বার করেছে, শরীর চর্চা, খেলাধূলার নানা পদ্ধতির আবিষ্কার করেছে, প্রয়োগ করেছে। তারা সমাজ গড়েছে, সমাজের জন্য কিছু নিয়ম নীতি চালু করেছে। এ সবই প্রকৃতির বুকে মানুষের সৃষ্টির নিদর্শন। এ সব কিছু, যা মানুষের গড়া এতেই তার সংস্কৃতির পরিচয়। সাহিত্য সমাজের সৃষ্টি, সমাজের পরিচয় তার সংস্কৃতিতে ধরা পড়ে। সেই দিক থেকেই সংস্কৃতির পরিচয় পর্যালোচনার প্রাসঙ্গিকতা।

"সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ ও ব্যক্তির জাতিগত সত্তার ভুমিকা স্বীকার করতে হয়।"[৩] প্রাকৃতিক অবস্থান, মাটির প্রকৃতি,তার জীবনযাত্রার পরিচালক। আমাদের আলোচ্য এলাকার কিছু অংশ অরণ্যময় লাল কাঁকুরে মাটি এলাকা, অন্য অংশ অবশ্য পলিগঠিত মৃত্তিকা অঞ্চলে, এ অবস্থায় দুই ধরনের মানবসমাজ এখানকার বাসিন্দা। একদল অরণ্যবাসী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় মানবগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী। এঁরা পরিবর্তনের ধারাকে মান্যতা দেখালেও পূর্বপুরুষেরা ঐতিহ্যকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে চলেছেন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানের সাথেও তাদের চলতে দেখা যায়।

আমার গবেষণার বিষয় সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতি ও তার বির্বতন। আমি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে Questionnaire Mathod (প্রশ্নকরণ পদ্ধতি), Personal Interview (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি), Group Interview (দলগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি) ইত্যাদির মাধ্যমে এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করেছি। বিষয় নির্ভর আলোচনার থেকে এ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর জোর দিয়েছি। সেগুলি ক্রমপর্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি।

১) **ভাষাগত বৈচিত্র্য** ঃ-

ভাষা ভাবের বাহন। মানুষ কণ্ঠোচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনির সাহায্যেই একে অপরের সাথে ভাবের আদান প্রদান করে। ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে তার সামাজিক পরিচয় প্রকাশিত হয়। এখানকার ভাষায় মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবই লক্ষিত হবে। বাংলা ভাষার অন্তর্গত উপভাষা হিসেবে স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া' 'গ্রন্থে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা নামে একটি উপভাষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং তাঁর চলনের সীমানা হিসেবে কেলেঘাই নদীর উত্তর অংশে ও কাঁথি মহকুমার কথাই উল্লেখ করেন।'[৪] বোঝা যায় তিনি মূলতঃ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। এদিক থেকে আলোচ্য অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে 'দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা' নামকরণ বোধ হয় বেমানান হয় না।

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে "বাংলার চারটি উপভাষার পাশাপাশি এই অঞ্চলের ভাষাকে একটি 'বিশেষ ভাষা' রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এখানকার মানুষের ব্যবহৃত ভাষা রাঢ়ীরই একটি রূপ বিশেষ।"[৫] পরে সুকুমার সেন, তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে "ঝাড়খন্ডী নামে একটি উপভাষার কথা উল্লেখ করেন।"[৬]

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আরণ্যক জনজাতি ও অন্ত্যজ। অপেক্ষাকৃত অসুবিধার মধ্যে উচ্চবর্ণের আধিবাসীরা প্রধানত কর্মসূত্রে তথা জীবিকা সূত্রে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। এও দেখা যায় যে, এখানকার মানবগোষ্ঠী সকলে যে যার মতো সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা ও রীতিনীতি অনুসরণ করে আসছেন। রীতি-নীতির মতো ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে যার গোষ্ঠীগত ভাষাই ব্যবহার করেথাকেন। এই সাথে প্রশাসনিক কাজে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা ও এঁদের মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। "সংখ্যা গরিষ্ঠ মাহাতো সম্প্রদায় তাঁদের কুর্মালি বা কুড়ুমালি ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। হাড়ি, মুচি, ডোম, কাঁডরা, খাদাল, নমশূদ্র প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ওউচ্চবর্ণের মানুষজন এখানকার আঞ্চলিক ভাষাতেই কথাবার্তা বলে থাকেন।"[৭]

সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে সর্বদা ভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। "এই অঞ্চলে তিনধরনের কথ্য ভাষার রূপ প্রচলিত। এক সাঁওতালি-মুন্ডারি-কোলীয় ভাষা, দুই কোলীয় ভাষা মিশ্রিত ঝাড়খন্ডি বাংলা, ভূমিজ মাহাতোদের ভাষা, তিন সামান্য বাংলামিশ্রিত ওড়িয়া ভাষা, দক্ষিণ-পশ্চিমা ঝাড়খন্ডী বাংলা বা ডাঁয়া ঝাড়খন্ডী বাংলা।"[৮] আবার নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে ওড়িয়া ও বাঙালি উভয় ভাষাশ্রেণীর জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের প্রচলিত কথ্য ভাষার ধারা দুটি। এক বাংলা মিশ্রিত ওড়িয়া,

দুই উত্তরাঞ্চলীয় ওড়িয়া ভাষা। মাহিষ্য, কৈবর্ত্য ভাষা মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার রূপ।[৯]

১। সাঁওতালী-মুন্ডারী-কোলীয় ভাষা

ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ-

১। সাঁওতালী-মুন্ডারী ভাষায় নাসিক্য বর্ণের প্রভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যেমন - ইঞ্ (আমি), সেরেঞ্ (গান) ইত্যাদি।

২। শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত্যে 'আ' বর্ণ অবস্থান করে। আদিতে - অড়, অকাট, দলমা, জল। মধ্যে - শিমল, পাঁজর, আদল, চামর বগল। অন্ত্যে - শব্দের অন্তে 'অ' কিছুটা প্রলম্বিত উচ্চারিত হয় - ধব- (অ), খাট (অ)।

৩। এই ভাষায় স্বভাবত সৃত অনুনাসিক্যীভবন ঘটে যেমন -

অঁটা - (কোমর)
তিঁত - (তিক্ত)
উঁচু - (উপরে)

৪। রাঢ়ি বাংলা উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই এই ভাষায় লক্ষণীয়।

খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ-

১। চলিত বাংলার মতো এই ভাষাতেই নঞর্থক ধাতু ব্যবহৃত হয়। চলিত বাংলায় 'নহ' সাধারণ বর্তমান কালে প্রযুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে এই উপভাষার লই, লত, লোইস, লয়, লন (বাক্য ন > ল) আর লহে (আর নয়)।

২। চলতি বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে যেখানে 'না' বসে উ. প. ঝা. গাঁ. তে সেখানে ডাঁ. ঝা-র মতোই নাই বসে। যেমন - না গেলে - নাই গ্যালে (গেলে), নাহলে - নাইহলে।

৩। এই ভাষাতে ক্রিয়াপদের সঙ্গে সাত্ত্বিক 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার করা যায়। যেমন - খাবেক, যাবেক ইত্যাদি।[১০]

সাঁওতালি-মুণ্ডারি-কোলীয় ভাষার শব্দভাণ্ডার

দা-(জল)

বুলুম -(লবন)

বিলি-(ডিম)

কটকম -(কাঁকড়া)

উতু-(তবকারি)

দারে-(গাছ)

হাকু-(মাছ)

জিল-(মাংস)

দাকা-(ভাত)

উজা-(সোজা)

খেজড়ি-(মুড়ি)

কহরি-(খিচুড়ি)[১১]

সাঁওতালি মুন্ডারি কোলীয় ভাষার বাক্‌কেন্দ্রিক মৌখিক সাহিত্য

শুধু রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ নয়, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সাহিত্যই আদিতে শ্রুতি নির্ভর ছিল। সাঁওতালিতে একটা কথা আছে, 'অল খন দ থুতি গে সারেসা' অর্থাৎ লেখার থেকে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ। এই মানসিকতার জন্যই বোধহয় সাঁওতালি সাহিত্য বহুকাল ধরে শ্রুতির আকারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাঁওতালি ব্যক্তিরা বাড়ির দেওয়ালে নানা রকম গাছ, পাতা, ফুল ইত্যাদির ছবি আঁকেন যাকে ফ্রেসকো বলা হয়। কিংবা গরু মহিষের গায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম সাংকেতিক চিহ্ন আঁকেন। এটা সাঁওতাল জনজীবনের এক ঐতিহ্য। তবুও তাঁরা লিপি তৈরীর কথা ভাবেননি বা চেষ্টাও করেন নি। সাঁওতালি সাহিত্য রচিত হয়েছে মুখে মুখে এবং তা স্থান পেয়েছে মানুষের স্মৃতিতে। প্রসঙ্গতঃ একটি সাঁওতালি গানের উল্লেখ করা হল যেখানে লিপি বা অক্ষর প্রসঙ্গ রয়েছে প্রচলিত গানটি হল -

"মুরমু ঠাকুর কো দ বাবা,

পুথি বাবা কো পাড়হাওয়া,

বাদোলী কঁয়ডা গাড়তে লিখন চালাআ কান।"

অর্থাৎ মুরমু ঠাকুররা পুঁথি পড়ে। বাদোলী কঁয়ডা গাড়ে 'দুর্গ' লিখন যায়।[১২]

এই গানটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় সাঁওতালি তথা খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর মধ্যে একদা লেখার প্রচলন ছিল বা লিপির ব্যবহার ছিল। সেই লিপি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে অথবা ব্রাহ্মী লিপির সাথে বিলীন হয়ে গেছে। লিপি হারিয়ে গেলেও মৌখিক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি, তা খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর মানুষদের স্মৃতি বেয়ে আজও বহমান।

সাঁওতালি ভাষার রচিত ছড়া

এখনও সাঁওতাল গ্রামে দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন রাস্তার ধূলোয় বা অন্যত্র খেলাধূলা করাকালীন যদি কোনো অপরাধ করে তখন সেই অপরাধীকে ধরার জন্য একটি ছড়ায় দলের একজন সবাইকে উদ্দেশ্য করে ছড়ার এক একটি শব্দ উচ্চারন করে। যার কাছে ছড়ার শব্দ থামে তাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় ছড়াটি এইরকম -

"একাম দকাম তিনিক ঠয়া
লাল গামছা বাদম খচা
টিয়া কাক পুলি চাট" [১৩]

বাংলা শব্দ মিশ্রিত ছেলে মেয়েদের খেলার এই ছড়াটির কোনো আক্ষরিক অর্থ নেই।

আর একটি ছড়া যা ছেলেমেয়েদের খেলার সময় বলে থাকে। তা হল -

"সিম সিমালো সিমালো
ভালুক লাটা পাটা
কোনো পায়রা ডাক দিল
গুড়ুম ঢুচ পায়রা..." [১৪]

বাংলা শব্দ মিশ্রিত এই ছড়াটিরও কোনো আক্ষরিক অর্থ নেই। আবার বাংলা ভাষায় এর অনুবাদও অসম্ভব। এমনিভাবে ছেলেভুলানো আর একটি ছড়া হল-

"আল বাবু রাঃ
সিম চুপি পাঃ" [১৫]

বাংলায় অর্থ - কেঁদো না খোকা কেঁদো না
মুরগির লেজ পুড়িয়ে দেব।

অপর একটি ঘুম পাড়ানি ছড়া-

"নিদ দো বাবা গো
আলম রাগা গো
এঁগাম দয় কৌঁমিকানা
আপুম দয় সিয়োঃ কানা
দি নো.....।"

বাংলায় অর্থ-

"ঘুম ঘুম বাবা আমার
আর মোটেই কাঁদিস না
মা তোমার কাজ করে
বাবা তোমার লাঙল চষে
ঘুম ঘুম......।" [১৬]

হেঁয়ালি বা ধাঁধা

হেঁয়ালি বা ধাঁধাকে সাঁওতালরা কুদুম বলে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল[১৭]

১)কুদুম্‌রে কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ
মিৎটাং বুড়হি
সেতাঃ আকান সো ক উমেয়া।।(তেলা-চুলহী)
বাংলা- চিল চিল হেঁয়ালি
এক যে বুড়ি ঠান
সকাল হলেই তারে করাও স্নান।। (উত্তর -উনুন)

২) কুদুমরে কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ
লাচ্‌ মেনাঃ তায়া পটা দ বাং
মচা মেনাঃ তায়া ডাটা দ বাং।।(তেলা- ঠিলি)
বাংলা- চিল চিল হেঁয়ালি
পেটে আছে নাড়ি ভুড়ি

মুখ আছে তার দাঁত নাই।।(উত্তর-কলসী)

৩)কুদুমরে কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ

দুলৌড় কাতেক হেম কিদিঞা

বানার তি তেক থাপা কিদিঞা।। (তেলা-তুমদাঃ)

বাংলা- চিল চিল হেঁয়ালি

ভালোবেসে কোলে নিল

দুহাতে চাঁটি মারল।।(উত্তর-মাদল)

প্রবাদ প্রবচন এবং বাগধারা[১৮]

১। অকা লেকাম এ্যর আ, অনা লেকাম ইর আ।

বাংলা- যেমন কর্ম তেমনি ফল।

২। আপনারাঃ জমতে বির হাতি লাগা।

বাংলা- ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়ানো।

৩। একেন ঠিলি দ সাডে গেয়া।

বাংলা- ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশি।

৪। জানুমতে জানুমগে সাহা হোয়োঃ।

বাংলা- কাঁটায় কাঁটা তোলা।

৫। ছুটকি এরা তেরেল সাহান চেটে চেটে গেয়া।

বাংলা- যেমনি বুঁনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

৬। হিরম এ্যরা এতকা শিকিড় বাং সাহাওঅঃ।

বাংলা- অহি নকুল সম্পর্ক।

৭। ইনি চেঁড়ে রাঃ গে ।

বাংলা- সব শেয়ালের এক রা (ডাক)।

৮। চাগাড় মচা।

বাংলা- ঠোঁট কাটা।

৯। লো দাকারে ধুড়ি এ্যর।

বাংলা- বাড়া ভাতে ধূলি দেওয়া।

১০। এতাং লুটি।

বাংলা- গোপন কথা গোপনে রাখতে না পারা।

২. দক্ষিণ পশ্চিমা ঝাড়খণ্ডী বাংলা বা ডাঁয়া ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ঃ

ক) **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

১) মান্য চলিতে ণ, ন রুপে উচ্চারিত হয়। ণ- র এর স্বতন্ত্র উচ্চরণ নেই।

মান্য চলিত	ডাঁঃঝা
চিকণ	চিকন(উঁ)

২) ল-ব ডাঁ ঝা-তে ল-এর দন্তমূলীয় এবং মূর্ধন্য উভয় উচ্চারণই হয়। তবে শব্দের আদিতে ল-র কোনো রকম উচ্চারণই হয় না, ল > ন তে পরিনত হয় যেমন- লোক > নোক, লতা > নোহো, লাট > নাট, লাল > নাল, লাটা > নাটা।

৩) র-শুধুমাত্র ন ল নয় ডাঁ ঝা তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দন্তমূলীয় (কম্পিত) 'র' এর ও মূর্ধন্য (তাড়িত)উচ্চারন হয় যেমন- নারিকেল > নাড়িয়া, বজ্র > বোজোড়, খচ্চর > খ্যাচড়, হরিৎ > হড়ব ,[১৯]

খ)রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ-

১। চলিত বাংলায় রা, এরা, গুলি, গুলো প্রভৃতি বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যোগ করে বহুবচন বোঝানো হয় কিন্তু ডাঁয়া ঝাড়গাঁয়ী ভাষার এর পরিবর্তে 'গা' এই বচন নিদের্শক বিভক্তি ব্যবহার করে বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন টকাগা (ছেলেগুলো)।

২। শব্দের সঙ্গে ঈ (ই) নি, আনি, আন, আ ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয় যোগকরে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ নির্মাণের রীতি ডাঁয়া ঝাড়গাঁয়ীতে দেখা যায়। যেমন কাকা কাকি ই প্রত্যয় ।

৩। মান্য বাংলায় ব্যবহৃত প্রায় সব ধাতুই ডাঁ ঝা তে আছে।[২০] এছাড়াও এমন কতগুলি ধাতু এ ভাষায় আছে যা একান্ত ভাবেই আঞ্চলিক মান্য বাংলায় যাদের ব্যবহার নেই যেমন পকা, প্রক্ষেপণ, পখলা, খ্যাঁতা।

<u>ডাঁয়া ঝাড়খন্ডী বাংলার শব্দ ভান্ডার</u> ঃ

<u>ডাঁ. ঝাঁ.</u> <u>মা. চ.</u>

পন্‌স - কাঁঠাল

তুঁড় - মুখ, ঠোঁট

অদা - ভেজা

আঁইখ - অক্ষি

কোল - ঝগড়া

খত - গোবর সার

ঘিনা - কাহেরে ঘিনি অচ্ছুঅ কীস

জগাড়া - আনাজ কাটা

মড়া - গালাগালি অর্থে

আঘু - আগে

আই - মাতামহী

আঁগা - জামা

উথলিয়া - ডানপিটে

কেঁড়রি - কেন্নো

খিরি - পায়স

খেসু - চুলকানি

গাঁড়ুয়া - বালিশ

গোপী - আড্ডাবাজ[২১]

■ দক্ষিণ পশ্চিমা ঝাড়খন্ডী বাংলা বা ডাঁয়া ঝাড়গাঁয়ী ভাষার মৌখিক সাহিত্য

ঃ ছড়া ঃ

লোকসাহিত্য ধারার একটি উপাদান হল ছড়া। লোকসাহিত্য গবেষকদের মতে, ছড়াই ধারার আদি রূপ। ছন্দোবদ্ধ কথাগুলি জীবন অভিজ্ঞতা সূত্রে বানিয়ে নিয়ে লোক পরম্পপরায় ধরে রেখেছে। এ এলাকায় ছড়াগুলির ভাষা প্রায় দক্ষিণ পশ্চিমা ঝাড়খন্ডী বাংলা বা ডাঁয়া ঝাড়গাঁয়ী বাংলার পরিকল্পিত রূপ।

এই ভাষায় রচিত একটি ছেলে ভুলানো ছড়া হল-

" আসো আসো ছাগুলি, ফুল কুড়েইতে যাবা,
ফুলের কাঁটা গোড়ে ভুঁকনে, দুলিয়ে চড়ি যাবা,
দুলিয়ে আছে ছপণ কউড়, গনতে গনতে যাবা,
গটায় কউড় অধিক হিনে, গাই বাছুর কিনবা,
গাইয়ের নাম রাধিকা, বাছুরের নাম দুধিকা,
গাই গেলা খালে খালে, বাছুর গেলা নালে নালে।"[২২]

এই ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশুর ঘুম পাড়ানো কথা বলা হয়ে থাকে। সব ছেলেগুলিকে মা তার নিজের খোকার মতো ফুল কুড়ানোর জন্য ডেকে চলেছেন। পায়ে কাঁটা বিঁধে গেলে দোলায় চড়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। দোলায় আছে ছপন কউড়(টাকা) তার একটি দিয়ে গাই বাছুর কেনার প্রস্তাব রয়েছে। এই ছড়া শুনতে শুনতে ছোটো খোকা মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে।

আর একটি অন্য প্রসঙ্গের ছড়া উল্লেখ করা হল। এখানে শিশুদের গোচারণের কথা উল্লেখ রয়েছে। ছড়াটি হল-

"আয় আয়রে কাজল পাতিয়া
গাই চরাইতে যাবা,
মা বাপ গাল দ্যানে যুগী বেশ হবা।
ভোক পাইনে খাবু আষাড়িয়া ফল,
শোষ পাইনে খাবু কাঁসাই নদীর জল,
নিদ মাড়নে কঁঠে শুবু
গাই প্যাট তল।"[২৩]

এই ছড়ায় দেখা যায় শিশু সকল মিলে গাই চরাতে যাওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। বাবা মা গালি দিলে যুগীর বেশ ধারন করার কথা বলা হয়েছে। ক্ষুধা পেলে আষাঢ় মাসের বন্য ফল খাবে, তেষ্টা পেলে কাঁসাই নদীর জল পান করবে এবং তাদের ঘুমানোর স্থান হবে গোরুর পেটের তলা। এর মাধ্যমে শিশুদের কৌতুহল ও আনন্দ আরোও বাড়ে।

আর একটি শিশুদের ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া হল-

" আসো আসো জন মামু শারদ-শশী
আমা ঘর বাবু সাঙ্গরে খেলব বসি,
মাছ কাটনে মুড়া দবা,
ধান কাটনে কুঁড়া দবা,

গাই দুইনে দুধ দবা,

দুধ খাইতে বাটি দবা,

আমার বাবু সাঙ্গরে আসো খেলব বসি।”[২৪]

মনোহর দৃশ্যটি শিশুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জ্যোৎস্না ভরা রাতে বৃষ্টির পরে আকাশ পরিস্কার থাকে তখন চাঁদের আলো মায়াবি রূপ ধরে এমন সময় ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে শিশুকে শুইয়ে অথবা কাঁধের উপরে ফেলে রেখে আকাশের জ্বল জ্বল চাঁদকে শিশুর খেলার সাথী হবার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, শিষ্ট বাংলায় প্রচলিত একটি ছড়ার সাথে এর ঘনিষ্ঠ মিল দেখতে পাওয়া যায়। ছড়াটি নীচে উল্লেখ করা যাক-

“ আয় আয় চাঁদ মামা, টি দিয়ে যা,

চাঁদের কপালে চাঁদ, টি দিয়ে যা,

মাছ কাটলে মুড়ো দেব,

ধান ভাঙলে কুঁড়ো দেব,

কালো গরুর দুধ দেব,

দুধ খাবার বাটি দেব,

চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা ।”[২৫]

অনেকটা ভাষান্তরিত বলে মনে হতে পারে। যদি হয়ে থাকে, তবে তাতে কবিত্বটি অবশ্যই বাদ পড়েনি। উভয়ক্ষেত্রেই স্নেহের দুলাল সন্তানের প্রতি মায়ের মমত্বের টানটি স্পষ্ট হয়েছে।

আর একটি ছেলেভুলানোর তথা ঘুমপাড়ানি ছড়া উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি হল -

“ নিদ মাউসি নিদ মাউসি আম দুয়ারকু আস,

আম ছুয়ার চোখ্‌রে নিদ নাহি, নিদ ঘিনি বস।”[২৬]

এর সাথে প্রচলিত বাংলা ভাষার একটি ছড়ার ভাবের মিল দেখা যায়।

“ ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি, মোদের বাড়ী এসো

খাট নেই, পালঙ্ক নেই, খোকার চোখে বোস।”

দুই ছড়ার ভাবের সাদৃশ্য ছড়ার অন্তরের সাদৃশ্যকেই স্মরণ করায়।

আর একটি ছড়া -

“ খাঁদা নাখি মাদার ফুল,

সনা হাঁসে ভুল্ ভুল্।(সনা-ছোট শিশু)”

এর পর কতগুলি ছড়ার উল্লেখ করা যাক, যেগুলি খেলার ছড়া বলে এতদ্ অঞ্চলের জনসমাজে সুবিদিত।

১. " মুসা ধান খায় কুটুর কুটুর ,
নেজটি নাড়ে ছুটুর পুটুর,
বাঘ পানি খায় ঝুঁপা ঝুঁপা,
শিয়াল ববায় হুয়া হুকা।" [২৭]

২. " আদুড় বাদুড় মিঠা,
যে ফল খায় তিতা।"

৩. " ছ ছ পইসা পাকা তেঁতুল,
খাবু কতবা, খাবু কতবা।"

৪. " খরার মা খরি রে
চন্দন কাঠ ঘুরিই দে। "

৫. " আয় গো আজা গো,
আলোয় আস, আঁধারে যাও
পুর দিয়া পিঠা খাবলে খাও,
পড়িয়া ভূঁইয়ে কাচাড় খাও।"

৬. " সাইকেল বালা সাইকেল বালা,
পড়ি গেনে মোর ভালা।"

আর একটি অনুষ্ঠান এ অঞ্চলে পালিত হয় তা হল 'পড়িয়ন'। কালীপূজোর পরদিন ভোরে বাড়ির ছোট ছেলেদের ঘুম থেকে তুলে মুখহাত ধুইয়ে মুছে পরিপাটিকরে সাজিয়ে দেওয়া হবে। তেল হলুদও মাখিয়ে দেওয়া হয়। যাতে ভোরে পাখিরা শিশুদের পরিপাটিও সুসজ্জিত দেখতে পায়। তারা ঘরের কুলা নিয়ে লাঠি পিটিয়ে বাজাতে থাকবে আর মুখে নিম্নলিখিত ছড়াটি বলতে থাকবে।

" যা রে মশা যা,
উলিই তলে যা,
বাঁশবনে যা,
ঘরের দেবতী ঘরে যা
উড়ুশ মশা বাহিরে যা " [২৮]

অর্থাৎ মশা ও উড়ুশ (ছারপোকা) অর্থাৎ ছার পোকা ঘরের বাইরে চলে যায়, আর ঘরের লক্ষ্মী অর্থাৎ দেবতা ঘরে থাকুন। কতগুলি ছড়া পাওয়া গেছে তাতে বিবাহিত কন্যার শ্বশুর বাড়ীতে কষ্ট পাওয়ার অন্তর্বেদনার কথা প্রকাশ পায়।

১) “হাতি প্যাট তলে গদি বিছানা,
মাগো, তোর নেজকানি মোর বিছানা,
কুঁয়াবেড়ি পানি খায়ে কেমন্তে মাগো,
মাতা ছাড়ি মুই রঁই কেমন্তে,
হাঁড়িশালে আছে পাথরি পিঁড়ি,
ভোক লাগিনে না খাঁও বাড়ি,
হাঁড়িশালে আছে যুথিকা পিঁড়ি,
মোর গোতুর ছাতি যায়ঠে ফাটি,
সনঝা দেইথিব সনঝা বেতিকু,
ধ্যান করিব মোর পালঙ্কু, কাকি গো,
খাতির করিব মাতা পাশকু” [২৯]

মেয়ের বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময়কাল চিত্রটি এখানে বর্ণিত হয়েছে।

আরোও একটি বা দুটি ছড়ার আকারে পরিবেশিত হল -

২) “আম কশি কশি বউল কশি,
দান দেইএ থিল জাঁঙে বসাই, বাবা গো,
দান দিল দিল দক্ষিণা দিল,
গাই বাছুরিকি মো নামে দিল, বাবা গো,
গাই বিকা টাকা পাই ভরতি,
ঝিএ বিকা টাকা ঘর ভরতি, বাবা গো,
গোরু বিকি দিল গোরু গোহালে,
ঝিএ বিকি দিল পর ঘরকু, বাবা গো।” [৩০]

৩. “উচাঁ বালি মাটি ডালিম লাঠি,
উত্তর পশ্চিম উধে হউদি, কাকি গো,
নিরিগিরি রাজা পূজা পাউছি,
নিরিগিরি রাজা নামে বাড়িয়া, কাকি গো,
তাপ দেনা গদি জড় নাড়িয়া,
জড় নাড়িয়ারে বাইশা দাঁত,
রথি পারামানি ধাঁওদি রথ,
মাতা ডাকি দিঅ কড়েকো নাউ,

ধীর ভাঙি পুষ্প মোকে দউ,
উয়া চাউল কশাফলকু দিলা হাতে, কাকি গো,
অতপর বিদাই করল মোকে,
মাঝু বাহিরে কি হাঁটুয়ে পাঁক
ঝিয়ারি বাহিরিলা বাজাক শাঁখ, কাকি গো।"[৩১]
৪. " ঝিঙা ফুল ফুটল দাদা, ভোজনেতে বসি,
মায়ের কাছে বলবি দাদা, ভালো সুখে আছি,
দেহের ময়লারে দাদা কোদালেতে চাঁচি,
মাথার উকুনেরে দাদা পেতি বাঁদরে বাছি,
বারো হাত কাপড়রে দাদা তের হাত কানি।"[৩২]

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে বাংলায় অরণ্যবাসী অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকেরা জীবিকার প্রয়োজনে, কালের প্রভাবে বর্ণহিন্দু সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান গুলোকে তাঁরা বাদ দেননি, বর্ণহিন্দু সমাজ ও এঁদের প্রতি সহমমর্মিতা দেখিয়েছেন। ফলে পর্ব ও উৎসবের গান-কথায় ভাষার মিশ্রণে বর্ণিত বিষয়ে উচ্চবর্ণের প্রভাব পড়েছে। এসব গান নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজের সময়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপন আপন সমাজের উৎসবের এই ছড়াগানগুলো তাঁদের শ্রমের মধ্যে বিনোদন ও কষ্টসাধ্য কাজে প্রেরণা যোগায়। যেমন-

"সাধের কুরচি ফুল কিঁলিল জাতিকূল,
সাধের কুরচি ফুল।"

নয়াগ্রাম থানায় একটি জঙ্গলের পাশে বট অশ্বথের তলে 'তপুবন' (তপোবন)। বাল্মীকির তপোবন বলে স্থানীয় এলাকায় পরিচিতি লাভ করেছে। স্থানটিতে রাম-সীতার মূর্তির পূজাও হয়ে থাকে। একটি মন্দিরও আছে। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরনাটি নদীর মাহাত্ম্য লাভ করেছে। নলীনী বেরার সাম্প্রতিক উপন্যাস 'শবর চরিত' এ এই স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে। আরণ্যক সমাজে সেইসূত্রেই হয়ত বা রাম-সীতা কেন্দ্রিক গীত পাওয়া যায়-

" রাম ভাঙেন তরু ডাল,
আর লক্ষ্মণ ধরেন শিরেগো,
হায় হায়, তাহার ছায়াতে সীতা
চলেন ধীরে ধীরে গো।"[৩৩]

প্রচলিত ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালি

এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধাঁধা বা হেঁয়ালির প্রচলন ছিল, সেগুলি হল -

১. নিমন মজা, মজিনাই তার উঠে গজা। - ব্যাঙের ছাতা
২. ডেঙ্গা মামুর কাখে ছা।- ভুট্টা
৩. ডেঙ্গা মামুর পূঁজ মিঠা। - আখ
৪. উঠে পড়ে ধঁড়া সাপ যে নাই ভাঙায় তার মেড়া (ভেড়া) বাপ।- ঢেঁকি
৫. গটায় মাহাড়ার বারোটি ছা, গটায় ডাকতার মিনিটে মিনিটে দেখে।- হাত ঘড়ি
৬. জীব নাই, মুহু নাহি, তার সাঁগে মোর অনেক কথা।- বই
৭. গটায় বাড়ির তিনটি মুড়।- মাটির উনুন
৮. অতটুকু পাখিটা খুদ মল মল খায়, মুদি দকানে যাই করি ডিগপাজি খায়।- পইসা (পয়সা)[৩৪]

ডাঁয়া ঝাড়গাঁয়ী বাংলা ভাষার প্রবাদ

১.আঁড়িয়া আঁড়িয়া নড়েই নাগে বাছুর ছার ঠ্যাং ভাঙে। (রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রজার প্রাণ যায়)

২.উথলির উৎপাত, মরণের আধঘাট।(ডানপিটে স্বভাব অনুচিত)

৩. উঠ বলনে কাঁধে বগচা।(তৎক্ষণাৎ কাজ)

৪. উশাস মাটি এ বিলেই হাগে।(সহজ কাজে মন দেওয়া)

৫. একাকে বকা। (একাকীত্ব)

৬. কোলহুড়ি কল করে নি, জোহো জালি কোল করে।(হিংসুটের কাজ)

৭. কাজ নাহি থিনে মাটিয়া ধান বাছে।(আসলকাজ ছেড়ে অন্যকাজে মন দেওয়া)

৮. কানা গোরুর আলদা গোঠ। (বিভেদ সৃষ্টি করা)

৯. গাধা পানি খায় গুলেই ঘাঁটেই।(সহজ কাজ কঠিনভাবে নেওয়া)

১০. চোরকে আলোহো সয়নি।(প্রতিকূল পরিবেশ)

১১. গাঁয়ের কনিয়া সিঁগন নাখি। (গেঁয়ো যোগী ভিক পায়না)

১২. ছেলির গোড়ে ধান মলা যায় না। (যোগ্যতা অনুয়ী কাজ)

১৩. অভাগার ঘরে সুখ হিনে দিয়াসী ঘর যায়। (হটাৎ বড়লোক হওয়া)

১৪. চড়কা পড়লে শ্রীরাম ভজে। (মরনের সময় হরিনাম)

১৫. চোরের সাতদিন ত গিরহিয়ার একদিন। (চোরের শাস্তি হয়)

১৬. চোরে কামহারে ভেট নাই।(অহি-নকুল সম্পর্ক)

১৭. ছাট নাহিনে পাঠ হয়নি। (কষ্ট পেলে বিদ্যা অর্জন সফল হয়)

১৮. জমির ভিতা মাহাড়ার সিঁতা। (সোজা অর্থে)

১৯. ডিহি কুকুরের ভূখা সার।(নিজ স্থানে বীরত্ব দেখানো)

২০. ডেঙ্গা ঘাই খুঁজি থিলা, গলা ঘাই পাইগেলা।(মেঘ না চাইতে জল)

২১. তিন মুড় যার, বুদ্ধি নিবু তার।(বিদ্যা বুদ্ধি ও বিকেক সম্পন্ন ব্যাক্তি)

২২. দড়া মাজনে ছোটো, কথা মাজনে মটা। (বিশ্বাসে মিলায়ে সুর, তর্কে বহুদুর)

২৩. ধীর পানি পাথর কাটে।(স্বল্পভাষী ব্যাক্তি অসৎ প্রকৃতির হয়ে থাকে)

২৪. ধানে ধান মিশি যায়, গড়াগড়ি আলদাহি যায়।(রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রজার প্রাণ যায়)

২৫. নুয়া যোগী ভিখে বাই।(নতুনের প্রতি বেশি আকর্ষণ)

২৬. নিমুন মঁহা সর্বস্ব খায়।(লক্ষ্মীছাড়া)

২৭. নিঁয়া খাইনে আং রা হাগে। (যেমন কর্ম তেমন ফল)

২৮. নাভের বেলা বাপ-পো, হানের বেলা সুস্‌রা জাঁই। (সুযোগ সন্ধানী ব্যাক্তি)

২৯. নিঁয়া কভূ অদানা, পুলিশ কভূ দাদানা। (স্বাবলম্বী)

৩০. নুহা সস্তা হিনে শিয়ালভি টাঙ্গিবহে।(সস্তার মাল বস্তা বস্তা)

৩১. পষ্ট কথায় কষ্ট কি।(স্পষ্টভাষী)

৩২. পরের ধনে পরধনী, সুকা বিকা মহাজনী। (পরের অর্থে নিজের বড়াই)

৩৩. বুঢ়া কালে কেঁদরার ছো।(বুড়ো বয়সে ভীমরতি)

৩৪ বাঁদরের পূঁজি গালে হাত।(স্বল্প মূলধনের ব্যবসা)

৩৫. বাঁশ ফুলনে মরে, মানুষ বুলনে মরে।(অলসতার দুঃখের শেষ নেই)

৩৬. বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম।(শক্তিশালী)

৩৭. বেশী নোকে মুসা মরেনি।(বেশি লোকে কাজ সফল হয় না)

৩৮. বাহা ঘরে মাহাড়া রাজা।(বিয়েবাড়ীতে মহিলাদের আধিপত্য)

৩৯. বসি খাইনে সমুদ্রের বালি কূলায়নি।(অলসতার দুঃখের শেষ নেই)

৪০. ভোকে গরু বেনা খায়। (খিদে পেলে সবই খেতে বাধ্য)

৪১. ভালা থিলা, ভালিয়া নাগেই ঘা করলা।(খাল কেটে কুমির আনা)

৪২. ভাগ্যবানের বঝা ভগবান বহে। (সৌভাগ্যবান)

৪৩. মাগারু হিন নাই, দিয়ারু পুণ্যনাই।(দান করা পুণ্য কর্ম)

৪৪. মাগনায় টক ঘোল বি মিঠা।(বিনেপয়সার জিনিস)

৪৫. মরি গেনে সরি গেলা ।(আজ মরলে কাল দুদিন)

৪৬. মাড় কে দেবতা ডরে। (মার কে সবাই ভয় করে)

৪৭. মামু ঘর যউটা,আজা ঘর সৌটা।(মামু ঘর ও আজা ঘর একটা)

৪৮. মা মরনে বাপ মাউসা। (জননী/জন্মদাত্রী মা)

৪৯. যে যার ডিহে, সে আঁড়িয়া।(নিজ স্থানে বীরত্ব দেখানো)

৫০. যার সাজে, হাগতে গেনে বাজনা বাজে।(যোগ্যতা অনুযাই কর্ম)

৫১. যার যেমন মন চলছে বৃন্দাবন।(মনের মতো)

৫২. যে পানি বহে, সে কি সোষে মরে।(কর্ম করলে অভাব হয় না)

৫৩. রাশিয়ার গরু পকেই মরে। (অংশীদারি ব্যবসা অনুচিত)

৫৪. সাসুর পালিএ ত বহুর পালিএ।(সবারই একদিন সুসময় আসা)

৫৫. হাতি চালি থাউ, কুকর ভূখি থাউ। (ভালো লোকের পিছন ফিরে দেখতে নাই)

৫৬. হাতি বনে বাড়নে কার? রাজার।(অন্যের কাজে বেশি মনদেওয়া)

৫৭.সিয়ালেরও দরকার হিনে পর্বতে যাই হাগে।(বিপদে পড়লে অন্যের দ্বারস্ত হওয়া)

৫৮. হিসাবের গরু বাঘ খায়নি।(কষ্টকরলে কেষ্ট পাওয়া যায়)

৫৯. আকাশকে খঁটা নাই, বড়নোককে উওর নাই।(সম্মান জানানো)

৬০. গাইতে গাইতে গলা, বহিতে বহিতে নালা।[৩৫] (গান অভ্যাস করলে সুন্দর গলা হয়, জল বইতে বইতে নালর খাত তৈরী হয়)।

৩। বাংলা মিশ্রিত ওড়িয়া ভাষা

ক) **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** ঃ

১। দক্ষিণ পশ্চিমা বাংলার উপভাষর মত আদিতে ‘ও’ কার কি করে ‘উ’ কার হয়ে যায়, যেমন - খুড়া > ঘোড়া, লুক > লোক, গুটিএ > গোটিএ (একটি) ইত্যাদি।

২। ব্যাঞ্জনান্ত পদে আদি ‘ও’ কার লোপ পায়- যথা মর (মোর,মোহর), তর (তোহর, তোর)ইত্যাদি। আবার অন্ত্যস্বর লোপের স্বল্পতা একে উড়িয়া ভষার সাথে একত্র স্থানওকরে দেয়।

৩। রাঢ়ি বাংলার উপভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।[৩৬]

খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ-

১। সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হল অসমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রাধান্য বেশি।

২। কর্তৃ কারকের ‘র’ বিভাক্ত প্রাধান্য পায়।

৩। এই ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম পদ হল আমে, তুমে ইত্যদি।

বাংলা মিশ্রিত ওড়িয়া ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

অছাড়-আড়ালে

অঁটা - কোমর

অবাতবা - অনিশ্চিত

অশদিয়া - অশৌচ

অল্বনিয়া - এলেবেলে

অর্খিত,অর্চ্ছিত - হতদরিদ্র,অভাগা

আউবালি- বিরক্ত

অটঙ্গা,আটাঙ্গা - বিচালি

উয়া - আতপ চাল

আঙ্ড়া,আভ্ড়া - (অবিবাহিত)

কটি, কচিয়া- কনিষ্ঠ, ছোট

কুই- ছোট মুখ হাঁড়ি বিশেষ, গৃহস্থলী শষ্য রাখার হাঁড়ি

খেঁগা - গৃহস্থালী-কাজ

গ্যান্সা- নোংরা, ময়লা

খিলকাতি - সুপারি কাটার জাঁতি

টুকনা - ঘটি

পনখি - বঁটি[৩৭]

বাংলা মিশ্রিত ওড়িয়া ভাষার মৌখিক সাহিত্য

এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বাংলা মিশ্রিত ওড়িয়া ভাষারও প্রচলন রয়েছে। তার দৃষ্টান্ত দু একটি ছড়া, কয়েকটি ধাঁধা বা ঢক ও কয়েকটি প্রবাদের মধ্য দিয়ে দেখনো হলো।

ক। <u>ছড়া</u>[৩৮]

১. “হলধর ভাই নল ধর,
চক্রধর ভাই কি পাঁই মলে,
গছর থিলে পঞ্চপান্ডব,
মরি বনবাসে গলে।”
২. “নানা ভাই টানা রে,
মোর কথাটি শুন।
বিলের মাছ চিল খাইলা,
পটা খঁড়িয়ে বুন।
পটা গেলা ভাসি রে,
দউড়ি গেলা খসি।”
৩. “আয় আয় রে তিতির বনি,
গাই কিনতে যিবা।”

খ।হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁ[৩৯]

১. জালুয়া রে জালুয়া,
ঘাটে শুইয়ে কার সালুয়া,
স্বামীর পুত্র,আমার ভাই,
কি জিজ্ঞাসা জালুয়া ভাই।-- মামা ভাগ্নে
২. উপর নে পড়লা ঢু,
বাপের জন্ম নাই ,পো খোঁজে বউ।- ঢেঁকি
৩. বলনে মা মাড় খায়
নাই বলনে বাপ আঁইঠা খায়। - মায়ের এঁটো খাওয়া

গ। প্রবাদ প্রবচন[৪০]

১. ভাত ছাড়ে সাঙ্গ ছাড়ে নি। (অতি বন্ধুত্ব)

২. বাধা নাই মানে গাধা। (দেখাশোনার অভাব)

৩. ওলের সাক্ষী মান।(যোগ্যতমের যোগ্যসুরী)

৪. বিঁধা মারি করি পনশ পাকনা।(বিপদ ডেকে আনা)

৫. যউতবার কথা সৌউঠে। (যেখানের কাজ সেখানে)

২. উৎসব ও অনুষ্ঠান

সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের জনজাতিরা বছরে বিভিন্ন সময়ে নানা উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। সেগুলি হল নবান্ন ও মাঁওলি বাঁধা, মকর সংক্রান্তি, ডাক সংক্রান্তি, শুক্রহেলা, মশা তাড়ানো, প্রস্তর পূজা, বৃক্ষ পূজা, করম পূজা, বাঁধানা উৎসব, বাহার বাঁধা, পড়িয়ন, সাধভক্ষণ, পৌড়াণ-অষ্টমী, আঙড়া পুনেই(কুমার পূজা)[৪১] অঁরাধ পান্তা, নতূন হাঁড়ি, ভাদু উৎসব, টুসু উৎসব, মোহরম, গাজন, চড়ক, পাহাড় পূজা, দেবস্নান-পূর্ণিমা, ইঁদপরব, গমা জামাই, চিতো অমাবস্যা, পাঁঠা বলিদান গ্রাম থানে ছলন দেওয়া ইত্যাদি।

সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকায় বিভিন্ন সময়ে যে উৎসবগুলি পালিত হয় তা হল নিন্মলিখিত -

১) **নবান্ন ও মাঁওলী বাঁধা** ঃ- ১লা মাঘ কৃষিবর্ষের সূচনা হিসেবে ধরে এই নবান্ন উৎসবের সূচনা। ১লা মাঘ থেকেই সুবর্ণরেখার পাশাপাশি বিশেষ করে গোপীবল্লভপুর, কুটিঘাট, মালিঞ্চা, ঢোপগাড়িয়া, বাকড়া, আলমপুর, পাতিনা, মধুবন, রামেশ্বর, ভসরাঘাট, কুলটিকরি, কেশিয়াড়ী, রোহিনী, রগড়া, সোনাকনিয়া, মালাই, ভক্তাপাট, মহাপাল, আগড়বনি প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষেরা মকর সংক্রান্তি স্নানের মধ্য দিয়ে নতুন বস্ত্র পরা, মান, কুঞ্জিয়া, পাছিযা (ঝুড়ি) প্রভৃতিকে পরপর সাজিয়ে অর্থাৎ কুঁচিয়া পরে কাটা, তারপর মানের উপরে পাছিয়া দিয়ে বাঁশের তৈরী এই সমস্ত জিনিসগুলির উপর আতপচালের বাটা দিয়ে মাখিয়ে দেওয়া হত।[৪২] সেখানে বাহারটি ভালো করে গোবর জল দ্বারা নিকানো হত সেখানে আতপ চাল বাটা জল দিয়ে তার উপর বাঁশের তৈরী এই সমস্ত জিনিসগুলোকে তিনটি জায়গায় সিঁদুর লাগানো হয়, ফুল দিয়ে পুজো করা হয়। এই পুজো সাধারণ বাড়ীর প্রধান কর্তা ব্যক্তি পুরুষরাই করত। এক্ষেত্রে শঙ্খ বাজানোর রীতিও প্রচলন আছে। মকর সংক্রান্তির আগের দিন বাড়ির গরুর সিংএ সরিষার তেল মাখানোর প্রচলন আছে। মূলত এই বাহার বাঁধা অনুষ্ঠানটি কৃষি বর্ষের আর্থাৎ ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এবং তা সঠিক পরিমাণের জন্য এই উৎসবের আয়োজন। যেমন কুঞ্জিয়া একটি ধান চাষের সময় মজুরদের মুড়ি দেওয়ার

কাজে লাগে, কাটা একটি চাল ওজন করার কাজে লাগে, মান এটিতে ধান বের করার পর বাহারে ধান ওজন করার কাজে লাগে।

২) **ডাক সংক্রান্তি** ঃ- আশ্বিন মাসের শেষে এই অনুষ্ঠান হয়। এই সময় সাত শাগা অর্থাৎ সাত ধরনের শাক রান্না করে খওয়ার প্রচলন । এই সময় বাড়ির ছেলে মেয়েরা মাথায় সরিষা তেল মেখে থাকে। ঠাকুমা ঠাকুরদাদাদের বলতে শোনা যায় মাথায় তেল না দিলে কাক ঠোকর মারবে। এছাড়া এইসব প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী মাথায় তেল দেওয়া শারীরিক সুস্থতার কথাও শোনা যায়। এই সংক্রান্তিতে বাড়ির গরুগুলিকে নদী থেকে চান করিয়ে আনা হত। এই সময় মাটিতে পুঁতে থাকা তালকে কেটে ভেতরের শাঁস (নরম অংশ) খাওয়ার রীতি প্রচলন আছে। তালটিকে তার মোড়ার অংশটি নিয়ে শ্রাবন মাসেই মাটিতে পুঁতে রাখা হত। কার্তিকের শুরুতেই এই তাল বীজ হতে শুরু করে। তালের এই নরম অংশটি কোজাগরীর প্রধান হিসেবে ব্যবহৃত হত। ডাক সংক্রান্তির আগের দিন নতুন মাটির হাঁড়ি পুজো করার প্রচলন আছে। যেটি সুবর্ণরৈখিক ভাষায় **'নুয়া হাঁড়ি'**[৪৩], এই সময় নতুন মাটির হাঁড়ি ও তার ঢাকনির (সরা) ভিতরে অল্প জল দিয়ে আবার সুবর্ণরেখার পূবালি দিকটিতে তিন বা পাঁচ বা সাত রকমের সব্জি রান্না করে পুজোর প্রচলন ও প্রচলিত আছে। বর্তমানে মাঝি, জেলে, দন্ডমাঝি, ভূইঞ্যা এদের মধ্যে ডাক সংক্রান্তির প্রচলন আছে।

৩) **শুক্রহেলা** ঃ- সুবর্ণরেখার পাশাপাশি অঞ্চলগুলো বিশেষ করে নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, রোহিনী অঞ্চলের অধিবাসীরা শুক্রহেলা (ধানের গোছা, ধান ও গাছ সমেত) উৎসব পালন করে থাকে। এটি পুরুষদের দ্বারাই কাটা হয়ে থাকে। ভাদ্রমাসে এই অনুষ্ঠান একটি ধান কাটার শুভ সূচনা। নতুন বস্ত্র নিয়ে আসা হয়। ধান গাছ সমেত শুক্রহেলা তুলে নিয়ে আসার সময় কোনো বাক্যালাপ করা নিষেধ, বাক্যালাপ করলে অমঙ্গলের সূচক বলে অনেকে বলে থাকে। হেলা নিয়ে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াতে হয়, বাড়ির মেয়েরা নিয়ে আসার পর ব্যাক্তির পা ধুয়ে ঘরে তুলে। ঘরে লক্ষ্মীমঙ্গল মায়ের সূচনা করা হয়। তারপর একটি কাঠের পিড়িতে আলপনা দিয়ে ফুল সিন্দুর দিয়ে পুজো করা হয়। এই হেলাটি ঘরের মাঝে থাকবে প্রতিদিন মঙ্গলদীপ জ্বালানো হয়।

ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষের নবান্ন অনুষ্ঠানের দিন এই শুক্লহেলার পুজো করে আউস ধানের চিড়ে ও নতুন আউস ধানের ভাত খাওয়ার প্রচলন আছে।

৪) **গমাজামাই** ঃ- ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গমাজামাই অনুষ্ঠান করে থাকে। এটিও কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান। ধানকে এখানে কন্যা স্বরূপ দেখা হয়। তাই বাড়ির কন্যা জামাইকে আমন্ত্রণ করে নতুন বস্ত্র পরিয়ে পিতামাতার আশির্বাদ জ্ঞাপন করে বিভিন্ন ভোজের মাধ্যমে উৎসবটি পালিত হয়।

৫) **পৌড়াণ অষ্টমী** - অগ্রাহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রাস পূর্ণিমার পরে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পিতা মাতার প্রথম সন্তানকে নতুন বস্ত্র পরিয়ে এই উৎসব পালন করা হয়। এতে পিতামাতার জ্যেষ্ঠ্য সন্তান কিছু কিছু খাওয়ার নিয়মরীতি আছে, যেমন- মুলো, খসলা শাক, বেগুন পোড়া, শুটকি মাছ, গাঁদা ফুলে ছোঁয়া নিষেধাজ্ঞা আছে। এই অনুষ্ঠানের রীতি হল সন্তানের মামা বাড়ি থেকে নতুন বস্ত্র পাঠানো। সন্তানটি কাঁচা হলুদ, ঘি মেখে চান করে নতুন বস্ত্র পরে পিতামাতেকে প্রনাম করে অনুষ্ঠান পালিত হয়। শঙ্খধ্বনিও দেওয়া হয়।

৬) **পড়িয়ন** ঃ- কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই অনুষ্ঠান হয়। জঙ্গল থেকে বেনা গাছ নিয়ে এসে বিনুনি পাকিয়ে ঘরের বাইরে সদর রাস্তার মাঝখানে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়। সিঁন্দুর, চন্দন, আলপনা, ফুল দিয়ে পুজো করে। গ্রামের এক মাথা থেকে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিকেলবেলা ঢাক, ঢোল, সানাই বাজিয়ে জোয়ান ছেলেরা ঐ বেনা গাছের বিনুনিটি কোমরে বেঁধে তোলে কারণ বেনা গাছটি খুব শক্তভাবেই পোঁতা থাকে। তুলতে পারলেই পুরস্কার।

৭) **মশাতাড়ানো** ঃ- কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ভোরের প্রাক্কালে এই অনুষ্ঠান হয়। এটি সাধারণত রোগ নিরাময়ের জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। টিন, কুলো, ডালা প্রভৃতি সরঞ্জাম নিয়ে তাতে সুবর্ণরেখার পাশাপাশি অঞ্চলে বিশেষ করে রোহিনী, নয়াগ্রাম ঐ অঞ্চলের আখের লাঠি দিয়ে বাজনা বাজিয়ে এই উৎসব পালন করা হয়। এই নিয়ে গান প্রচলিত আছে।

"ঘর দেবতি ঘরে যা / ডাঁইনি মশা উড়ে যা।"[৪৪]

৮) **<u>ধান ফুলানো</u>** ঃ- আশ্বিনের সংক্রান্তিতে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সকালে বাড়ীর মজুররা এক ধরনের বাঁশের কাঠি বেশ কিছু কেটে এনে বাড়ীতে রেখে দেয়। এর পর সরকাঠির পাতা দিয়ে কিছু বনজ ঔষধ দিয়ে রাত্রে পুজো করে বেঁধে সেগুলিকে তুলসী মঞ্চের কাছে রাখা হয়। ভোর বেলায় ঐ কাঠি নিয়ে ধানের জমিতে পুঁতে দেওয়া হয়। এতে সাধারণ মানুষের ধারণা ধানের ফসল ভালোভাবে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এটি আনড়োল নামে পরিচিত। এই নিয়ে লোক গানও আছে-

"ধান ফুলো ফুলো,
এতে আছে আদা,
ধান পড়ে গাদা গাদা.
....
এতে আছে পুন্য বড়,
মরিয়া করে কড় কড়,
ধান ফুলো ফুলো।"[৪৫]

৯) **<u>বাহার বাঁধা</u>** ঃ- কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথির পরের দিনে বাহার (উঠান) পুজো হয়ে থাকে। বাঁশের চালা (এটি মুড়ির বালি বের করার কাজে লাগে) দিয়ে বাহারে চালের গুঁড়ি দিয়ে বর্গাকৃতি ছক কেটে প্রতিটি ছকে কোথাও ধান, আতপ চাল, তিল, বিরি, মুগ, সরিষা, গম, সিঁন্দুর, হলুদ একশিকে পয়সা দিয়ে বাঁশের চালাটিকে ঢাকা দিয়ে পুজো করা হয়। বাড়ির মেয়েরাই এটি করে থাকে। রবিশষ্য আগমনের সময় এটি পুজো হয়।

১০) **<u>আঙড়া পুণেই(কুমার পুজো)</u>** ঃ- এটি আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হয়। এতে বাড়ির কুমার ও কুমারীরা নতুন বস্ত্র পরে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে পালন করা হয়। এই অঞ্চলের লোকেদের বিশ্বাস অনুযায়ী কোমরে নতুন ঘুমসী পরে কুমার কুমারীদের নিজের হাতে করে রাস্তায় রাস্তায় মুড়কি ছড়ানোর রীতির প্রচলন আছে। এতদ্ অঞ্চলে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের শুভ মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে এই ধরনের রীতি চালু রয়েছে।

১১) **<u>আঁরাধ পান্তা</u>** ঃ- ভাদ্র মাসের ষষ্ঠী তিথিতে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। নতুন মাটির হাঁড়িতে উনুনকে পুজো করে বিভিন্ন শাক সব্জি দিয়ে চাল, কুমড়ো, আমড়া প্রভৃতি নিয়ে আঁরাধ পালিত হয়।

১২) **<u>নতুন হাঁড়ি</u>** ঃ- চৈত্র মাসের সংক্রান্তির আগের দিন নতুন হাঁড়ি এবং তেলানটি ফুটো বা কালো দাগ যেন থাকে। ঐ হাঁড়ি এনে তাকে পুজো করে মুগের ডাল, কাঁচকলা, বেগুন, আম, ইঁচড় প্রভৃতি নিরামিষের মাধ্যমে নতুন হাঁড়ির উৎসব পালিত হয়। ঈষান কোনে কলা পাতায় সমস্ত রান্না দিয়ে পুজো করা হয়। এটি বাড়ির অগ্নি থেকে, সেই সাথে সারা বছরের অন্নের অভাব থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় পুজো পালন করা হয়।

১৩) <u>ভাদু</u> ঃ- দেবতা রূপকে মানবীয় জীবনবন্দনা সম্পর্কিত লোকগান প্রধানতঃ মহিলাদের মধ্যেই প্রচলিত। এটি বর্ষাকালীন উৎসব। এই পুজোয় কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ভাদ্র মাসে এই পুজো হয়। এটিও কৃষি বন্দনা। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতে এই পুজোর প্রচলন বেশি। নতুন সরায় গোবরের উপর ভাদুই ধান ছড়িয়ে ভাদুর রূপদান করা হয়। বর্তমানে মৃৎনির্মিত ভাদুর কুমারী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে নারীর পাশাপাশি পুরুষেরাও অংশ গ্রহণ করে থাকে। এটিতে বাগদি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি নিন্মশ্রেণীর মানুষেরা এর পূজো করে থাকেন। পূর্বে কুমারীদের দ্বারা এই পুজো হলেও বর্তমানে সধবা নারী ও পুরুষরা এতে অংশ গ্রহণ করেন। এটি সাধারণত মনের বন্ধু, আবার সন্তান কামনায় এই পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। যদিও এটি শস্য বৃদ্ধির মূল বিষয়, এই নিয়ে অনেক লোক কথাও প্রচলিত আছে। তবে ভাদু উৎসবকে কেন্দ্র করে ভাদু গানের প্রচলন বর্তমানে দেখা যায়। যেমন-

> "ভাদুর আগমনের গান,
> এনেছি বনের ফুল দিবগো চরণে,
> হার গাঁথিব পূজিব ভাদু ধান।"[৪৬]

১৪) **<u>টুসু পরব</u>** ঃ- জঙ্গল মহলের একটি জনপ্রিয় উৎসব টুসু। ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, পশ্চিম মেদিনীপুর টুসু উৎসবের প্রধান কেন্দ্র। এই উৎসব মুলত মাহাত, কুড়মী, বাগাল, বাউরি, ভুঁইঞ্যা, বাগদি এবং বিভিন্ন জনজাতি অংশগ্রহণ করে। পন্ডিতগণের মতে তুসু বা টুসু

উৎসব মুলত শস্যকামনার উৎসব, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিকামনার উৎসব। এই মতের নিরিখে টুসু গানে কৃষি এবং শস্য সম্পর্কিত বিষয়ের প্রাধান্য থাকার কথা। কিন্তু লক্ষণীয় যে, শস্য এবং কৃষি বিষয়ক গান অপেক্ষা ভূমি সন্তানদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, প্রেম-প্রণয়, বাদ-প্রতিবাদ, দুঃখ-দারিদ্র্য, সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন, রাজনীতি-সমাজনীতি- এক কথায় টুসু গান পশ্চিমরাঢ়ের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বক্র-জটিলতাময় মানবজীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তিতে পূর্ণ। এতে প্রতিফলিত অশিক্ষিতা নারী-মনের গোপন মনস্তত্ত্বের চিত্র, যুবক যুবতীর হৃদয়ের একান্ত বাস্তব কামনার প্রতিফলন।

নিরক্ষর মানুষের সাহিত্য সৃষ্টির অপুর্ব নিদর্শন এই টুসু গান। স্রষ্টা এখানে সকলেই। ঠাকুমা-দিদিমা, বধু-শাশুড়ি, কন্যা-নাতনি সব একাকার হয়ে যায়। বয়সের ব্যবধান এখানে উপেক্ষিত। শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্ন অবান্তর। টুসু গান সর্বস্তরের গান, মাটির গান, জীবনের গান।

টুসু গানের মুলত দুটি পর্যায়- আগমনি আর বিসর্জনী। অগ্রাহায়ণ সংক্রান্তির দিন টুসু প্রতিষ্ঠার পর গীত হল আবাহনের গান। আর পৌষ সংক্রান্তির রাত এবং পরের দিন গীত হয় বিসর্জনের গান। মাঝের দিনগুলি ভরে থাকে নানা বিষয়ের কথাকলিতে- টুসুর রুপ বর্ণণা, তার প্রতি মাতৃস্নেহের বারিসিঞ্চন, সখীত্বের অনাবিল সুসম্পর্ক স্থাপন, তার বিবাহ, তার শ্বশুরালয়ের বিবরণ তাকে মানব-মানবীর চিরন্তন আকর্যণ বিকর্ষণের কথা, নৈর্মিত্তিক, সুখ-দুঃখের কথা, বৈধ ও অবৈধ প্রণয়ের ছলাকলার কথা, সারা পৌষমাস ধরে চলে বহু বিচিত্র বিষয়িনী এই সংগীতের আলাপন। তারপর এই সময় বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে। চোখের জলে পৃথিবী ভাসে। গানের কথা ও সুরে বিষাদময়তা ফুটে ওঠে -

আবাহন-

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির সন্ধা-রাত্রি থেকে শুরু হয় টুসু বন্দনা, গীত হয় আবাহনের গান। ব্রতিনীরা সমবেত কন্ঠে টুসুকে আবাহন জানিয়ে গায় -

"উঠ উঠ টুসু, উঠ করা (ই) তে আ (ই) যেছি,
তুমারই বন্ধু সঙ্গী-সাথী পু (ই) জাতে তুমায় আ (ই) সেছি।[৪৭]
চাঁদকে যেমন তারায় ঘেরে তেমনি ঘেরন ঘেরোছি।
চা (ই) রদিগেতে পদীমশিখা, মাঝে তুমায় রা (ই) থেকেছি।
আহা কি রূপের বাহার কেউ ত কভু দেখিনাই,
হলুদ বরণ রাঙা চরণ এমন রূপের জুড়ি নাই।"

আবাহনীর পর গীত হয় টুসুর রূপ বর্ণনা, গানের পর গানে। গীত হয় গায়িকাদের কামনা-বাসনার গান। সবশেষে গীত হয় পুনরাহ্বানের গান-

" আ(ই) জ থাক মা নন্দরানি
আনন্দিত হয়্যেঁ,
কা(ই)ল তুমাকে পু(ই)জাব মা
যা পাব তা দিয়্যেঁ।"[৪৮]

এটিতে মুলত কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। মূল আচার, পূজা, অর্চনা তৎসহ লোকগান। টুসুর ঘট হয় দুই প্রকার নারীর মুখাবয়ব অবিকল, মাটির ঘট। এটি সাধারণত পৌষ সংক্রান্তিতে আয়োজন হয়। পরব চলে তিনদিন ধরে। এই গ্রামের টুসুর সঙ্গে অন্য গ্রামের টুসুর বিয়েও হয়। টুসুর সমাপ্তির পর, মকর ও সই পাতায়।

নিচে টুসু গানের একটি চিত্র-
" প্রকৃতি পরিবেশের গান
উপর খেতে হাল দাদা
নাম খেতে কামিন গে,
কোন খেতে রুইবো আমি
রানি কাজল ধান গে।"[৪৯]

১৫) **গাভি বাঁধনা** ঃ- গাভিকে বসন্ত(হাম) থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গাভিকে বেঁধে কুড়চি, কস্তুরী পাতা খাওয়ানো হয়। আবার গাভি গাভিন(অন্তসত্বা) থাকলে তাকে পিঠে

খাওয়ানো হয়। উলু দিয়ে তাকে পূজোকরা হয়। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে দুর্গাপুজোর সময় জনজাতির লোকেরা এই উৎসব পালন করে থাকে।

১৬) **গাজন** ঃ- জঙ্গল মহলে গাজন আড়ম্বরে পালিত হয়। শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন উভয়েই জঙ্গলমহলের জেলায় প্রচলিত। চৈত্র সংক্রান্তিতে (কোথা ও বৈশাখে) শিবের গাজন, জৈষ্ঠ্য আষাড় মাসে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। দুইই আদিম কোন সমাজের ভূত ও পুনর্জন্ম বাদের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে ভক্তদের আত্ম নির্যাতন গাজনে বিশেষ অঙ্গ। আগুনপাঠ, ঘাঁড়াটে, নরূপপাঠ, চক্রুপাট, উড়োপাঠ, জিভ ফোঁড়, রজনি ফোঁড়, চাটুফোঁড় প্রভৃতি সেই রকম অনুষ্ঠান। গাজন উৎসবে গান ছাড়ও ভক্তরা পরস্পর ছড়া কাটেন। তাকে জাম ডালি বলা হয়। গাজনের প্রচলিত গান হল-

" ভকতা ভাই ভকতা ভাই
কাঁইকু জিবু তুই?
কাকক গতে কেন্দুয়া বাঘ
দেখি আইলি মুই।" [৫০]

১৭) **ভীম পূজা** ঃ- ভীম পূজা জঙ্গল মহলের অন্যতম লোক উৎসব। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে পূজিত এই ভীম মহাভারতের দ্বিতীয় পান্ডব নন, ইনি প্রধান চাষি শিবের সহায়ক অনুচর। রামেশ্বরের শিবায়নে দেখা যায়-

" চন্দ্রচূড় বলে বৃষে চন্ডীরণ চায়ৎ,
পিছভীম চলিল চাষের সজজা লয়্যা।
নিমেশেকে ভীম ধান পেলাইলেক কাটি,
সরু সরু হাতের ভেলেক তিন মুঠি।"

১৮) **ইঁদ পরব** ঃ- ঝাড়গ্রামে ইঁদ পূজা বিখ্যাত। এই পূজার জন্য জঙ্গল মহলের সেরা জঙ্গলটি রাখা হয়। এতে এই জঙ্গলের গাছ কাটা বারণ। প্রতি বছর এই জঙ্গল থেকে সেরা গাছটি কাটা হয় ইন্দ্রধ্বস তৈরি করার জন্য। পূজারি গাছটি পৈতে পরিয়ে আসেন। রাধা অষ্ঠমীর দিন গাছ কাটা হয়। পরের দিন ডাল পালা কেটে পূজা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়।

এটিকে ইন্দ্রকুড়ী বলে। শুক্লা একাদশীতে গাছটিকে সাজানো হয়। মাথায় বেঁধে দেওয়া হয় শ্বেত ছত্র। ঝাড়গ্রামের মল্লদেব রাজারা এই উৎসব করে থাকেন। ইঁদ-এ তাদের একটি গান প্রচলিত আছে-

" যখন উঠবে ইদটি
তখন ভাঙে দিনটি
ঝাড়গাঁর গতে
ঠমকি ঠমকি হাতি চলে
ঝাড় গাঁর গড়ে।"[৫১]

১৯) **করম উৎসব** ঃ- সুবর্ণরেখা পাশাপাশি অঞ্চলের আদিবাসীরা তথা মাহাতো, মাঝি, দন্ডমাঝি, কেওটরা, হাড়ি, ডোমরাও ভাদ্র মাসে করম পূজা করে থাকে। এটিও কৃষি উৎসব। করম গাছের ডাল এনে বিভিন্ন কলাই বীজ দিয়ে এই পুজো করা হয়। দন্ডমাঝিদের পুরোহিত এসে করম ও ধরম দুই ভাইয়ের করম পূজার কাহিনী শোনান। হাঁড়িয়া খেয়ে নাচ ও গান চলতে থাকে। যেমন-

" আখড় বন্দনা -
করি সব দেবতার পায়ে পড়ি
আজরে করম খেলা রাতি।"[৫২]

সংস্কৃত 'কম' শব্দ থেকে 'করম' শব্দের উদ্ভব। অভিধান প্রণেতা রাজশেখর বসু এই শব্দের অর্থ নির্দেশ করে বলেছেন। করম < কর্ম, কর্মফল, ভাগ্য।[৫৩] অভিধান প্রণেতা সুবল চন্দ্র মিত্র তার গ্রন্থে বলেছেন করম শব্দের অর্থ - কার্য, কাজ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল।[৫৪]

করম উৎসব পশ্চিমরাঢ় ভূমির কয়েকটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় উৎসব। এটি মুলত শস্য, সন্তান ও সামাজিক মঙ্গল কামনার উৎসব। কর্ম করম শব্দের মূল। কর্মপ্রেরণা, কর্মফল, সুকর্ম ও অপকর্ম এবং শুভ ও অশুভ ফলের ইঙ্গিত করম কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বলে অনুমিত হয়। শুভকর্ম সম্পাদন এবং ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করে করম দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে শস্যোৎপাদন বহুগুণিত হবে এবং সন্তান সন্ততিতে সংসার ভরে উঠবে করম উৎসব তথা করম পূজার নেপথ্যে এই কামনা নিহিত।

বৃক্ষপূজার রীতি পশ্চিমরাঢ়ের আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। প্রকৃতিপীড়িত আদিম মানুষ প্রকৃতির ভীষণ ভয়াল রূপও শক্তি প্রত্যক্ষ করে হয়তো চিন্তা করেছিল সেই ভীষণ শক্তিকে বশে আনতে পারলেই তাদের দুর্দশার অবসান ঘটবে এবং জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে। সে উদ্বেশ্যেই তারা প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি বৃক্ষকে প্রতীকরুপে গ্রহণ করে শুরু করে প্রকৃতি বন্দনা। সুপ্রাচীনকালের সেই প্রকৃতিবন্দনার প্রভাব এতদ্ অঞ্চলের জনসমাজে আজও ক্রিয়াশীল। করম পূজা সেই প্রকৃতিবন্দনারই একটি অন্যতম অঙ্গবিশেষ যাতে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে করমবৃক্ষকে।

করম উৎসব দুটি করম ডালকে পাশাপাশি পুঁতে পুজো করার রীতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলেন- এ হলো করম রাজা ও করম রানির বিবাহ অনুষ্ঠান। করম রাজা সূর্য এবং করম রানি পৃথিবীর প্রতীক। দুইয়ের পরিণয়ের মধ্য দিয়েই প্রচুর শস্য সম্ভাবনা হতে পারে। করম উৎসবের আচার-অনুষ্ঠান ও উপকরণগুলো দেখলে এ ব্যপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। করম নাচের মধ্যেও এই শস্য কামনা ব্যক্ত হয়ে থাকে।

মাহাত, ভুমিজ, সাঁওতাল, ওঁরাও, ভুঁইঞ্যা, বাউরি, বাগাল প্রভৃতি উপজাতি ও অনুপজাতি গোষ্ঠীর সমাজে করম পূজার প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই করম পূজার উৎস সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গল্পকাহিনি প্রচলিত। তবে সব কাহিনিরই মূল কথা শস্য উৎপাদন ও শস্য রক্ষার প্রয়াস এবং করম দেবতার কৃপালাভ।

করম পূজায় ব্রতিনী কুমারী কন্যার দল, অবশ্য কোথাও কোথাও বিবাহিতা রমনীরাও এই পূজা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। উৎসবে এই কুমারীদের যোগদানের পশ্চাতে উর্বরতা ও প্রজননের ইঙ্গিতটি বিদ্যমান।

প্রতি ভাদ্রমাসের শুক্লা দশমী তিথিতে করম পুজার ব্রতিনীরা জঙ্গলে গিয়ে করম গাছ নির্বাচন করে তার গুঁড়িতে হলদে সুতো বেঁধে আসে। তারপর একাদশীর দিন সেই নির্বাচিত গাছটির দুটি ডালা কেটে ভক্তিসহকারে নিয়ে আসে গ্রাম প্রধানের বাড়ীতে। তাঁর বাড়ীর উঠোনে সেই ডাল দুটি পাশাপাশি পোঁতা হয়। তারপর মাদলের বাজনা আর গানের সুরে করম দেবতার হয় প্রতিষ্ঠা। ডাল দুটির একটি পুরুষ, অন্যটি প্রকৃতির প্রতীক। উভয়ের মিলনে ধরণী শস্য সম্পদে ভরে উঠবে, মানুষের অভাব অনটন দুর হবে। উৎসবের আচার, অনুষ্ঠান, উপকরণ ব্যবস্থা এবং নাচ গানের মুদ্রা আর ভাষার মধ্যেও সেই কামনার ইঙ্গিতই বর্তমান।

পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে কল্পিত তথা করম রাজা ও করম রানি রূপে প্রতিষ্ঠিত করমশাখা দুটি পাশে রাখা হয় জাওয়াডালিতে (তাতে থাকে নদীর বালি ও পঞ্চশস্যের বীজ)। পূজা হয় ধুপ-দীপ ও বিধিমতো নৈবেদ্য-সহকারে। করম কথা শোনান লায়া অর্থাৎ পুরোহিত। কথকতার পর সারা রাত ধরে চলে নাচ আর গান। পুজো শেষে পরদিন প্রাতে ব্রতিনীরা জাওয়াডালি ও করম শাখাদুটিকে নিকটস্থ জলাশয়ে বিসর্জন দিয়ে এসে পান্তাভাত খেয়ে পালন করে।[৫৫]

করম উৎসবকে কেন্দ্র করে যে নৃত্যকলার উদ্ভব তা করম নাচ, পাঁতানাচ বা দাঁ (ই)ড় নাচ নামে পরিচিত। এবং এই নাচের আনুসঙ্গিক হিসেবে যে গান গীত হয় তা করমগান, পাতানাচের গান বা দাঁ(ই)ড় নাচের গান নামে প্রচলিত। করম পূজার দিন এই নৃত্য-গীতের চরম স্ফূর্তি লক্ষ্য করা গেলেও মাসাধিকাল পূর্ব থেকেই চলে এর অণুশীলন।

শস্য এবং সন্তান কামনা করম উৎসবের মর্মমূলে নিহিত বলে এর নৃত্য-গীতের মধ্যেও সেই ভাবেরই প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে যেমন ধান রোয়ার মুদ্রা ফুটে ওঠে, স্বল্পাকার সংগীতগুলির মধ্যেও তেমন কৃষিবিষয়ক ভাব ভাবনাই প্রকাশ লাভ করে, কৃষিকর্মের উদ্বীপনা ও আনন্দ উথলে ওঠে-

" হাতে লিব বুঁদিটি কাঁধে লিব কাদাল(ই)লাঠি
মনের সুখে টা(ই)নে লিব চুটিটি
লহকে ধরিব আ(ই)ড় দুটি।"[৫৬]

প্রকৃতির বদন্যতায় উৎপাদন ভালো হলে সেই আনন্দ যেমন গানের ভাষায় ফুটে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে আবার প্রকৃতির বিরূপতায় ফসল না হলে এবং সে কারণে সংসার নির্বাহ করা সুঃসাধ্য হয়ে উঠলে সেই দুর্বিষহ জীবনের ছবিও প্রতিফলিত হয় করম গানের কান্না ঝরা ভাষায়-

"গেল বারের আকালে
কুথাও নাই ক্ষুদ মিলে
ভকে হায় পরাণ গেল জ্ব(ই)লে।"[৫৭]

করম গানের ভাষায় কখনো কখনো বিশেষভাবে দার্শনিক ভাবনার প্রতিফলনও চোখে পড়ে। জগৎ ও জীবনে সম্পর্কে নিস্পৃহতা ও উদাসীনতা ফুটে ওঠে-

" সাঁঝে ফুটে ঝিঙাফুল
সকালে মলিন হে[৫৮]
আ(ই)জ কেনে বঁধুর
বদন হায় মলিন হে।"

অর্থাৎ স্বল্পস্থায়ী সৌন্দর্যের মতো (ঝিঙাফুলের) মানুষের জীবন ও ক্ষণস্থায়ী। কাজেই দুঃখ সুখে বিচলিত হওয়া অর্থহীন। এজাতীয় ভাবনা প্রতিফলন আরো বহু গানেই লক্ষণীয়। সহজ সরল প্রায় মুর্খ মানুষগুলি হয়তো নিজেরাও উপলদ্ধি করতে পারেনি যে, তাদের মন থেকে এ জাতীয় সুক্ষ্ম ভাবনার প্রকাশ ঘটে গেছে। বস্তুত আনন্দ প্রকাশের আতিশয্যে দুঃখ দহনের তিব্রতায়, বাস্তবতায় প্রতিফলনে এমনকি দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধিতেও করম নাচের গানগুলির সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য।

২০) **বাঁধনা পরব** ঃ- কৃষির অন্যতম পূজা এই বাঁধনা পরব। কার্তিক অমাবস্যার রাত্রিতে গরুকে পূজা করার সাথে সাথে গরুর শিং-এ তেল মাখানো, মাথায় সদ্য কাটা ধানের মোড় পরানো, আল্পনা আঁকা, মোড়দা ঘসের আঁটি বিছানো, বাঘুত ছাদনা দড়ি বাঁধন দড়ির উদ্দেশ্য গোধ পূজা, নিমদান, বুড়ি বাঁধনা ইত্যাদি বহু রকম লোকাচার ও অনুষ্টান পালন করা হয়। নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুরের বাঁধনাতে দেখা যায় ৬টা মুরগী এর মধ্যে সাদা ও লাল রঙের ১টা ও অন্য রঙের মুরগী লাগে, শুকর লাগে, ফুল সিন্দুর মেথি দিয়ে গরুকে ভাত খাওয়ানো হয়। এই নিয়ে গানও প্রচলিত-

" অতদিন চরাই ছিলাম
হিড়ে গোড়ো
আজ হইছে অমবস্যার রাত।"[৫৯]

বাঁধনা পরব পশ্চিমরাঢ়ের মাহাত, ভুমিজ, বাউড়ি, বাগাল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত একটি লোক উৎসব। উৎসবের নামকরণ স্বপক্ষে দুটি কারণের কথা উল্লেখ

করা যেতে পারে। প্রথমত বন্দনা থেকে বাঁধনা। বন্দনা/বাঁধনা উচ্চারণে রূপান্তরিত। কৃষি নির্ভর পশ্চিমরাঢ়ের মানব সাধারণ কৃষির অন্যতম সহায়ক গবাদি পশুকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে, দেব জ্ঞানে আরাধনা করে। বাঁধনা উৎসব সেই গো-আরাধনা বা গো-বন্দনার উৎসব এবং উৎসবের অন্যতম অঙ্গ বলেই সম্ভবতঃ এই নামকরণ। দ্বিতীয়তঃ ভাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে পশ্চিম রাঢ়ের প্রায় সর্বত্র পূর্বোক্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্য গরু এবং কাড়াকে(পুরুষ মহিষ) খুটিতে বেঁধে খেলানোর প্রথা প্রচলিত। একে গরুখুঁটা এবং কাড়াখুঁটা বলা হয়। অর্থাৎ বন্ধন থেকেই বাঁধনা। উৎসবের শেষ দিনটিতে এই গরু বা মোষকে খুঁটিতে বেঁধে নাচানো হয় বলেও উৎসবের নাম বাঁধনা পরব হয়ে থাকতে পারে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বাঁধনা পরবের চুড়ান্ত অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকলেও এর প্রস্তুতি শুরু হয় প্রায় মাসাধিকাল আগে থেকেই। তারপর আসে কালীপূজার দিন। সকাল থেকেই শুরু হয় চুড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব। গো-মহিষাদিকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে গায়ে দেওয়া হয় রঙবেরঙের ছাপ। শিং দুটিতে দেওয়া হয় সিঁন্দুরের ডোরা ডোরা দাগ, মাথায় পরানো হয় নতুন ধানের শিস দিয়ে তৈরি মোড়(মুকুট)। বন্দনান্তে খাওয়ানো হয় তৃণাদি ছাড়াও বিশেষ দ্রব্য হিসেবে গুড় এবং চালের গুড়ি দিয়ে তৈরি পিঠে। গাই এবং গরুর বিয়ে দেওয়ার বিচিত্র প্রথাটিও অনুষ্ঠিত হয়। কালী পূজোর রাত জাগরণের রাত। গরু জাগানোর রাত। ঢাক-ঢোল-ধামসার গভীর শব্দে সমস্ত গ্রামকে উত্তাল করে তোলে যুবকের দল, মাঝে মাঝে গৃহস্থ বাড়ীর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে গায় গরু জাগানোর গান, গো-বন্দনার গান-

“ আহিরে-
জগোমা লছমি জাগোমা ভগবতী
জাগোত আমার(ই) সারা রাতি।
জাগে কা পতিফল দিবে মা লছমী,
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই-ই-ই।” [৬০]

অর্থাৎ, ওগো দেবি ভগবতী তুমি জাগ্রত হও। গৃহবাসীগণ তোমরা জেগে থাক। তোমাদের জেগে থাকার ফল তোমরা পাবে। লক্ষ্মীর কৃপায় ব্যায় ধন-সম্পদ ও গো-সম্পদে ভরে উঠবে।

গো-পালকের দল গোয়াল ঘরের কাছে গিয়ে গায় গো-বন্দনার গান। কৃষির পক্ষে অন্যতম সহায়ক গো-সম্পদের রুপ বর্ণনার গান। মমতা ঝরা কন্ঠে গো-সম্পদের রুপ কীর্ত্তন করে গায়-

" আহিরে-
কি আ বরন বরদা তোহরি ন অঙ্গরে,
কি আ বরণ দুই কান-আরে,
কি আ বরণ বরদা তোহরি দুই চক্ষুরে,
কি আ বরণ দুই শিং-আরে
আহিরে.......।" [৬১]

২১) **ঝুমুর** ঃ- জঙ্গল মহলের অন্যতম গান। জঙ্গল মহলকে জানতে গেলে ঝুমুর জানতে হবে। ঝুমুর রাঢ়বাসীর প্রানের সম্পদ। অনেকের মতে রাঢ় এলাকার দ্রাবিড় ভাষী মানুষের প্রেম সঙ্গীতের নাম ঝুমুর। জঙ্গল মহলের আদিবাসীরা তার জীবনের কথা এবং বিদ্রোহের কথা ঝুমুর গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন, যেমন- শবর আন্দোলন নিয়ে গান -

" কেশু ভাইয়ের ফাঁসি হইল,
বঘুনাথ মাহাত বাঁধাই গেল,
বাঁশ বনে ডোম হইল কানা,
রাগে জ্বইল জঙ্গল মহল থানা।"[৬২]

'ঝুমুর' শব্দটির অভিধানগত অর্থ সংস্কৃত 'ঝুমরি' শব্দ থেকে ঝুমুর এসেছে বলে অভিধান প্রনেতা হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন।হিন্দিতেও ঝুমুর মেলে 'ঝুমুর' নামে, সঙ্গীত দামোদরে উল্লিখিত হয়েছে-

"প্রায় শৃঙ্গার বহুলা মাদ্ধীকমধুমৃদু।
এই কব ঝুমরিলোকে বর্নাদিনিয়মোজ্ঝিতা।"[৬৩]

পদকল্পতরুতে আছে - ঝুমুর, ঝুমর গানে পায়েতে নুপুর অর্থাৎ ঝুমুর শব্দটি সেকালে একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু সর্বত্রই যে সেটি সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়।

যোগেশ চন্দ্র রায় তাঁর বাংলা ভাষা দ্বিতীয় ভাগে ঝুমুর শব্দটির উৎস করেছেন। তিনি লিখেছেন শব্দটি বোধ হয় সংস্কৃত ঘুর্ণ ধাতু হইতে এসেছে। গ্রাম্য গীতিতে ঝুমুর শব্দের উল্লেখ আছে।[৬৪]

"টুমরু তালে ডুমরু বাজাও ঝুমরুকে গান কর।"

ঝুমুর যে শৃঙ্গার বহুল রাগিণীর গীত। এই বিষয়টি কবি হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলিতে মেলে-বাসর ঘরে ঝুমুর কবি।

'ঝুমরি' শৃঙ্গাররসাত্নক রাগিণীবিশেষ এবং ঝুমুর নৃত্য-সংবলিত শৃঙ্গার রসাত্মক সংগীত বিশেষ।[৬৫]

অনেকের মতে ঝুমুর গানে রাধা কৃষ্ণ প্রেম কথা খুবই অল্পকালে এসেছে। পূর্বে এই প্রেম-সঙ্গীতের দেহজ প্রণয়ের কথাই ছিল মুল উপজীব্য সঙ্গীত দামোদর নামক বহু পুরাতন সঙ্গীত শাস্ত্রে ঝুমুরকে শৃঙ্গার বহুল মাদকতাময় সঙ্গীত হিসাবেই বর্ননা করা হয়েছে। বস্তুত বৈষ্ণবীয় প্রভাব ঝুমুর গানে বেশ কিছুটা পরিবর্তন আনে। তবে লোকসঙ্গীতের আসল বৈশিষ্ট্য এতে পুরোপুরি বজায় থাকে এবং আদিমতায় স্পর্শও অনেকটাই থেকে যায়। ঝুমুর সঙ্গীতে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা অনুপ্রবেশের কারণ হিসাবে কোনো এক সময়ে পশ্চিমরাঢ়ের বাঁকুড়ায় শ্রী-চৈতন্য পরিকর শ্রী-নিবাসের অবস্থান এবং মল্লরাজাদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরাগকে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুটি ঘটনা এতদ্ অঞ্চলকে যথেষ্ঠ প্রভাবান্বিত করেছিল। স্বাভবিকভাবেই এই অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত ঝুমুরের প্রেমরসের ধারার মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবও সঞ্চারিত হয়েছিল। মাহাত সম্প্রদায়ের কন্ঠেও ভাবে ঝুমুর গানের রূপচিত্রই পরিলক্ষিত হয়। এঁরা ঝুমুর গানের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণলীলারসই বিশেষ ভাবে আস্বাদন করে থাকেন।

অবশ্য ঝুমুরগানে কৃষ্ণকথার অনুপ্রবেশ ঘটলেও তা আসলে প্রকান্ডভাবে লৌকিক প্রেমগান। এই গানের গায়ক-গাইকারাও একান্তভাবে পার্থিব চিন্তা ও চেতনা সম্পৃক্ত, পশ্চিমরাঢ় ভূমির ভূখা-সুখা এই সব মানুষগুলির শিরায় শিরায় যত না রক্তের সঞ্চালন তদপেক্ষা বেশি সুর আর ছন্দের আন্দোলন। তাই ঝুমুর শুধু রাধা কৃষ্ণের অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, ঝুমুর গানের অসুরতম রূপটিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে রাঢ় অঞ্চলের সহজ সরল মানবসাধারণের জীবনকথা- যা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে রসিক নাচনির জীবনযাপনে ও জীবনভিত্তিক ঝুমুর গানের নিবেদনে।

ঝুমুরের উদ্ভব সম্পর্কে অনেকে বলেন, ঝুমুর শব্দ থেকে ঝুমুরের সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ঝুমুর গানে নুপুর ব্যবহার হয় সত্য, ঝুমুর গায়িকারা গানের আসরে নুপুর ব্যবহার করেন সত্য কিন্তু ঝুমুর তো কেবল নাচ নয়। নাচ অনুষঙ্গ মাত্র মুখ্য বস্তু সংগীত। ঝুমুর গানের আসরে যে নাচ প্রচলিত তা কোথাও কোথাও ঝুমুর নাচ নামে উল্লেখিত হলেও পশ্চিমরাঢ়ের প্রায় সর্বত্রই ঝুমুর গানের পরিচয়েই চিহ্নিত। ঝুমুর মুলত আদিরসাত্মক সংগীত। এদিক থেকে শ্রীখন্ডনিবাসী দামোদরের সংগীত। দামোদর এর ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে বাধা নেই যেখানে বলা হয়েছে ঝুমুর শৃঙ্গাররসাতক সংগীত এবং রাগিণী বিশেষও।

ঝুমুরের উৎস সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতের উল্লেখ করে সবিনয়ে বলা যায় যে, ঝুমুর আদিবাসী সংগীত নয় বা ঝুমুর সাঁওতাল সমাজের মধ্যেও সীমাবদ্ধ ছিল না কোনোদিন এবং প্রচলিত সাঁওতালি গানের সঙ্গে ঝুমুরের বিষয়বস্তু ও সুরের কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না কোনোভাবেই। তাছাড়া সাঁওতালিতে ঝমুর রচিতও হয়নি। তবে অত্যাধুনিক কালে দু-একটি সাঁওতালি ঝুমুর রচিত হলেও সেগুলিকে ব্যতিক্রম হিসাবেই চিহ্নিত করতে হয়।[৬৬] পক্ষান্তরে সু-প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি সাঁওতালি সংগীত হিসাবে পাতারাঢ়, দাঁশায় রাঢ়, সহরায়(বাঁধনা পরবে গানের সমতুল), রাঢ় বীর, (অরণ্য বন্দনা), রাঢ় হেড়য়েৎ প্রভৃতিই প্রচলিত। নিঃসন্দেহে বলা যায় সাঁওতালি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রাঢ়ের ঝুমুর গানের প্রচলন নেই। তবে কখনো কখনো কোন সাঁওতাল রমনীর কন্ঠে যে মধুর ঝুমুর গান শোনা যায় তা রাঢ়ের কুর্মী, সর্দার, বাগাল, ভূমিজ প্রভৃতি জাতিসমাজের সঙ্গে পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলশ্রুতি মাত্র। আসলে রাঢ় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় আদিবাসী সাঁওতাল শ্রেণীর বসবাস এবং সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি (কুর্মী, সিং, সর্দার, বাগাল প্রভৃতি) পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখেই এতদ্ অঞ্চলে বসবাস করে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমরাঢ়ের অপরাপর জাতি, বিশেষত কুড়মী ও ভুমিজ শ্রেণীর সঙ্গে আদিবাসী সাঁওতাল জাতির একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সেই কারণেই ঝুমুরের কোন একটি কলি কোন একটি সাঁওতাল রমনীর কন্ঠে ভেসে ওঠা অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু সেই হঠাৎ শোনা ঝুমুর গান থেকে কোন রকমেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে ঝুমুরের জননী সাঁওতালি লোকগীতি।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ঝুমুরকে সাঁওতালি সংগীত বলতে গিয়ে সাঁওতাল মাদল বাদককে 'রসিক' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয়ের উক্ত মন্তব্যটিও রাঢ়ের 'রসিক' প্রসঙ্গের সঙ্গে মেলে না। এই অঞ্চল 'রসিক' বা 'রস্ক্যা' তাকেই বলে যে ব্যক্তি 'নাচনি' নাচে বাদ্যবাজনা সহযোগে গান গেয়ে নাচনি নাচায়। নাচনির রক্ষককেও 'রসিক' বলার রেওয়াজ কোথাও কোথাও বর্তমান। সাঁওতাল সমাজে এই নাচনি নাচের কোন প্রচলন নেই। আরও উল্লেখ্য যে ভট্টাচার্য মহাশয় সাঁওতালি ঝুমুর বলে যে সকল গানের উল্লেখ করেছেন সেগুলি সাঁওতালি গান নয়। সেগুলি পাতানাচের গান বা দাঁড়শা(ই)লা ঝুমুর। এজাতীয় সংগীতে অবশ্য দু-একটি সাঁওতালি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটলেও ঘটতে পারে। তা ঘটলে বুঝতে হবে তা ঘটেছে স্বাভাবিক কারণেই কিন্তু তাই বলে ভাষাগত এই মিশ্রণের ঘটনা থেকে ঝুমুর গানকে সাঁওতালি সংগীত হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। সর্বোপরি সাঁওতালি ভাষা অষ্ট্রিক গোষ্টীর ভাষা, অন্যদিকে ঝুমুর মুলত দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর প্রেমসংগীত।

২২) **রাসপূর্ণিমা** ঃ- কার্তিকের শুক্লা পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা নামে চিহ্নিত। এই শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন পঞ্চক ব্রত পালিত হয়। আসলে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজোই এই ব্রতের প্রধান উদ্দেশ্য। বিবাহিতা রমণীরাই এই ব্রত পালন করে থাকেন। ভোরে উঠে গ্রামের প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করা বা সর্বজন ব্যবহার যোগ্য পুকুরে স্নান করে বালুকা পূজা করেন। সূর্যকে সকলে মিলে অর্ঘ্য দেন। তারপর সকলে একসাথে ব্রতকথা শোনেন। ছোলা মুগ ভেজানো ও গুড় এই ব্রতে প্রধান নৈবেদ্য দেওয়া হয়ে থাকে। এক সময় বয়স্কা রমণীরাই পূজা করতেন। এখন অবশ্য পুরোহিতরাই পুজো করে থাকেন। স্নানের ক্ষেত্রেও কিছুটা নিয়মের ব্যতিক্রম মানা হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই পাঁচদিন নিরামিষ খাওয়ার রীতি আছে। কথিত আছে বকও এই পাঁচদিন মাছ খায় না সে কারণে একে বকপঞ্চমীও বলা হয়ে থাকে। একসাথে মঞ্চ তৈরি করে রাধা কৃষ্ণের পূজা হয়ে থাকে। একে বলা হয় রাসোৎসব।

২৩) **মকর সংক্রান্তিঃ**- পৌষ সংক্রান্তি এই এলাকার সকলের পর্ব বিশেষ। সুবর্ণরেখার তীরে নানা জায়গায় এই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। এদিন সকালে স্নান করা পূণ্যকর্ম। মেলায় স্থানীয় লোকজন ভিড় করেন। কৃষিজাত দ্রব্যাদি এখানে বিক্রি করা হয়ে থাকে। গৃহস্থের ব্যবহার্য নানা উপকরণ এই মেলা গুলিতে কিক্রি হয়ে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা গৃহস্থালির আসবাপত্র নিয়ে মেলায় আসে। এই দিন পিঠে খাওয়ার নিয়ম আছে। পূর্বরাত থেকেই পিঠে তৈরি ও খাওয়া হতে থাকে। গুড় পিঠা ও পুর পিঠা বা মাড়া পিঠা এদিনে বিশেষ খাদ্য। খামারে বা খলায় মোহ পূজা হয়ে থাকে। খামারে মাঝামাঝি মোহি বা একটি খুঁটি পোঁতা থাকে। সেখানে খামার পরিস্কার করে নাতা দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। চাষে ব্যবহৃত সরঞ্জামই আলপনার বিষয়। একধারে গোবর দিয়ে ষাঁড়ের আকার বানানো হয়। সন্ধ্যে হলে গৃহস্থ সজাগ থাকেন, অপেক্ষা করতে থাকেন কখন শেয়াল ডাকে সেদিন অবশ্য শেয়াল কথাটি কৃষকের বাড়িতে উচ্চারণ করা মানা। তাকে সেদিন সাংকেতিক (স্যার) নামে উল্লেখ করাই নিয়ম। যেই শেয়ালের ডাক শোনা গেল সাথে সাথে ঘটির জল মহির চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বৃত্তাকারে। একে বলা হয় স্যার ধরা। স্যার ধরা নাহলে খামারে পূজো করার বিধি নেই। সাধারণতঃ গ্রামে রাতে শেয়ালের ডাক শোনা যাবেই। যাই হোক কৃষকরা বিশ্বাস করেন, শেয়ালের ডাক যেদিকে প্রথম শোনা যাবে, সেই দিকের মাঠে আষাঢ়ে প্রথম জল লাগবে। এ জন্য কৃষকরা আগাম প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

২৪) **দোলপূর্ণিমা** ঃ- ফাল্গুনে দোল পূর্ণিমা, রাধা কৃষ্ণের দোল যাত্রা। বৈষ্ণব সমাজে এ দিন বিশেষ উৎসব হয়। সকলেই রঙ-পিচকারি আবির নিয়ে একে অপরের গায়ে ছড়ান। সন্ধ্যায় বকুল গাছের ডাল ফাঁকা মাঠে পুঁতে অল্প শুকনো খড় পাতা ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। একে হোলি বলা হয়। এতে আবার ঘর থেকে বেগুন, আলু এনে পুড়তে দেওয়া হয়। ছোটোরা সেগুলির আগুন নিভে গেলে তুলে নিয়ে গিয়ে নুন দিয়ে খায়। এগুলো সাধারণত অল্পবয়সীরা করে থাকে। এখন এগুলোর জৌলুস কমে গেছে। যৌথ জীবন ভাবনা যত প্রভাব বিস্তার করেছে এসব গ্রাম কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান গুরুত্ব হারাচ্ছে। মঞ্চ তৈরি করে রাধা কৃষ্ণের পূজা হয়ে থাকে।

২৫) **চড়ক পরব** ঃ- চৈত্র সংক্রান্তিতে এই অঞ্চলে বহু স্থানে চড়ক মেলা বসে। এতে উড়া যাত্রারও ব্যবস্থা আছে। অরণ্যবাসী মানুষ কেউ কেউ এই দিন ব্রতের অঙ্গ হিসেবে জিভে শলা ফুঁড়ে বেড়ান। কোথাও বা চামড়া ফুঁড়ে দড়ি ঢুকিয়ে তারা নাচতে থাকেন। এসব তাঁদের দেবতার কাছে মানত পূরণের অঙ্গ হিসেবে অবশ্য পালনীয় বলে বিশ্বাস। মাঝে মাঝে ঐ ব্রতীরা কাহিল বা দুর্বল হয়ে পড়লে শিবের আশির্বাদি জল আমের ডালা ডুবিয়ে ছিটিয়ে দেন। তাতেই ঐ ফোঁড় করা ব্রতীরা আবার নাচতে থাকেন। এঁরা আবার উড়া গাছের উপর কাপড় দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ঘুরতে থাকেন। একেই উড়া বলে। এই সময় যিনি উড়েছেন তার গলায় মালা ছিঁড়ে নিচে ফেলে দেন। এই ফুল কুড়িয়ে এনে ঘরে রাখলে আর ছারপোকা হবে না বলে বিশ্বাস। ভক্তা নাচেরও আয়োজন হয় সব মেলায়। মেলা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মন্দিরে পূর্বেই হরিতকী দিয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন। সেই মত ভক্তরা সুন্দর ভাবে সাজগোজ হয়ে কপালে চন্দন ও কাঠ গোলাপ ফুলেরমালা গলায় নিয়ে ধুনুচি নাচ দেখিয়ে মেলায় আসেন ও সমবেত জনতাকে খুশি করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই নাচের ভিত্তিতে বিশেষত শিব মন্দিরের প্রশংসা হয়। এই নিয়ে চড়ক যাত্রার মহাসমারোহ। পরদিন নিয়া পাট শেষ করে মহামেলা হয়ে গাজন যাত্রা ঐ অঞ্চলের চড়ক পর্বের শেষ হয়। এই সব অঞ্চলে দীর্ঘকাল ব্যাপী শৈব ও শাক্তধর্মের ব্যাপকতার ধারাই বর্তমান। সবগ্রামে শিব, চন্ডি, কালি প্রভৃতি দেব-দেবী মন্দিরের অবস্থানে সহজেই চিহ্নিত। শিব দেবতা কেন্দ্রিক উৎসবে বনবাসীগণ ও বর্ণহিন্দু সকলে একত্রে উপভোগ করেন।

২৬) **আইখান** ঃ- পয়লা বৈশাখ এই অঞ্চলে আইখান বলে মানা হয়। ভোর থেকে বাড়ীর চারপাশে এমনকি বাগান বাড়ীর চারপাশে ঝাঁট দিয়ে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। এই ধোঁয়া ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ঘরের মঙ্গল হয়।

বাঁশের ঝাড়ে মাটি দেওয়া হয়। গোয়ালের গরুগুলিকে কলা পাতায় মুড়ে কাঁচা হলুদ থেঁতো করে নুন দিয়ে মেখে খাইয়ে দেওয়া হয়। এদিন গরুকে পুকুরে নামিয়ে চানও করিয়ে দেওয়া হয়। এদিন বাড়ীতে সকলকে কাঁচা হলুদ চিবিয়ে খেতে হয় ও কালমেঘের বা তেতো পাটের পাতার জল খেতে হয়। দুপুরে প্রত্যেক গৃহস্থ সাধ্যমত ভালো খাবার আয়োজন করেন। এইভাবে এই এলাকার সাধারণ জীবনযাত্রার ধারার একটি চিত্র তুলে ধরা যায়।

২৭) **ভাতছোঁয়ানি(অন্নপ্রাশন)**ঃ- পরিবারের শিশুরা জন্মের পর ছদিনের দিন সূতিকাঘরে ষষ্ঠীর পূজা হয়ে থাকে। একুশ দিনে ঘাটে ষষ্ঠীর পূজা করা হয়। এছাড়া 'মুখে ভাতে'র অনুষ্ঠানে ষষ্ঠীপূজা ও রাত্রে ষষ্ঠীমঙ্গল গানের আয়োজন হয়ে থাকে। এছাড়া শিশুদের অসুখ বিসুখের আরোগ্য কামনায় ষষ্ঠী দেবীর পূজা ও মঙ্গল গান করা হয় মানত পূরণ করার জন্য।

এছাড়াও সুবর্ণরেখা তীরবর্তী জনজাতিদের মধ্যে মহাসমারোহে নানান উৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয় বছরের বিভিন্ন সময়ে। যথাক্রমে - মাঘসিম্, বাহাপরব, এ্যারসিমৎ, দাঁশায় পরব, সহরায় ইত্যাদি।

৩। **লৌকিক দেবদেবী** ঃ- সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক দেবদেবীরা হলেন শীতলা, চন্ডী, সরস্বতী, রঞ্জাবতী, বাসুলী, থাকাল, ওলাবিবি, রঙ্কণী, যুগনী, ডাকাইবুড়ি, বড়াম, সিনি, সাবিত্রী, সর্বমঙ্গলা, কালামুহী, হিড়িম্বেশ্বরী, বর্গভীমা, ভবানী, কনকদুর্গা, গন্ধেশ্বরী, চিকুন্দ, বিলঝাঁপড়ী, গ্রামবুড়ির থান, বেনেবুড়ি, ফুলমণি, মেকিবুড়ি, কালষন্ডমা, গুপ্তমনি, মুন্ডেশ্বরী, কপিলাদেবী, ভৈরব, গরাম ঠাকুর, ভান সিং ইত্যাদি।

১। **মনসা দেবী** ঃ- এই অঞ্চলের বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় প্রায় শাস্ত্রীয় বিধি মেনে চলেন। তবে এক্ষেত্রে এঁদের প্রকৃতি নির্ভরতার কারণে কৃষি উৎসবে আড়ম্বর দেখা যায়। বোধহয় পরিবেশগত বাধ্যবাধকতা তাঁদের এইসব উৎসবে অংশ নিতে উৎসাহী করে মনসা পূজা প্রত্যেক গৃহস্থ জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ়ে অবশ্যই করে থাকেন। তুলসীতলা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে আছে। আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে এটি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানোও হয়ে থাকে। এছাড়া মাটি দিয়ে তৈরি মন্দিরের আকৃতির তুলসী মঞ্চ আছেই। তার পাশে সিজ গাছ মনসার উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। মনসা দেবীকে দুধ গুড় ও কলা নৈবেদ্য দিয়ে, পরিবারের সকলকে খাইয়ে দেওয়া

হয়। বিশ্বাস, সারাবছর সাপের বিষের ভয় থাকে না। জৈষ্ঠ্য মাসের সংক্রান্তিতে মাঝি এবং জেলেরা গঙ্গাপূজা করে থাকেন। নদীর পার্শ্ববর্তী বাসিন্দারা এ ব্যাপারে উদ্দ্যোগী।

২। **ষষ্ঠী পূজা** ঃ- ষষ্ঠী পূজা একটি বাৎসরিক উৎসব। ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই ষষ্ঠী পূজা হয়ে থাকে। দুরকম ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে। একপ্রকার কোনো ষষ্ঠী- গৃহস্থের ঘরের কোণে কচি, মান, হলুদ, বট, অশ্বথ, ধান গাছের ডাল একত্রে সুতোয় বেঁধে সেখানে ষষ্ঠী পূজা করা হয়। অন্য প্রকারে মাটির মূর্তি তৈরি করে পুকুর ঘাটে বসিয়ে পূজা করা হয়। সেখানে ছোটো ছোটো মাটির দলা রাখা হয় সেগুলো ষষ্ঠী দেবীর সন্তান সন্ততি। ইনি শিশুদের রক্ষা কর্ত্রী। সন্তানবতী রমণীরা আবশ্যিকভাবে উপোস করে পুজোয় অংশ নেন। এতে পাড়ার সকলে মিলে একসাথে পুজো করেন। ষষ্ঠীর দিনে অরন্ধনের প্রথাও আছে। নববিবাহিত বধুরাও সন্তান কামনায় এই পূায় অংশ নেন।

জনজাতিদের প্রচলিত ধারণা এঁর কৃপায় সন্তান সন্ততি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করে। সন্তান জন্মাবার ষষ্ঠদিনে রাত্রিতে গৃহকোণে ষষ্ঠী দেবীর আরাধনা করা হয়। এই দেবী উর্বরা শক্তির অধিকারী। ফলে স্ত্রী সমাজে এর পূজার্চনা দেখা যায়। ষষ্ঠী পূজায় প্রজনন শক্তি এবং মারী নিবারক যাদু শক্তিতে বিশ্বাসের বীজ নিহিত। এই ষষ্ঠী পুজোর আজও কোনো মূর্তি পুজো নেই। সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলের ঘরে ঘরে ষষ্ঠীপূজা প্রচলিত।

৩। **জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী** ঃ- জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমীতে মহিলারা কৃষ্ণ ও রাধার জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে ব্রত পালন করে থাকেন। রাধাষ্টমীর ব্রতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের প্রথা আছে। এতে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম ও বৈষ্ণব ভাবনার বোধহয় মিলন ঘটেছে। এই সব ব্রত পালনে পাড়ার সকলে মিলে দল বেঁধে অংশ নেন এবং একত্রে বসে ব্রতকথা শোনেন। বর্ণহিন্দু সমাজেই এগুলি মানা হয়ে থাকে।

৪। **লক্ষ্মীদেবী** ঃ- সুবর্ণরেখা নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলে লক্ষ্মীদেবীর পুজো ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। প্রতি অগ্রহায়ণ মাসের বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পুজো নিষ্ঠার সাথে প্রতি ঘরে পালিত হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে মাটির ঘরে নাতা দেওয়া হয়। পাকা ঘর সকাল থেকে ধুয়ে দেওয়া হয়। ঘরের চারি দিকে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। ঘরের দেওয়ালে আতপ চালের পিঠুলি দিয়ে ধানশীষ ও দরজার মুখে লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়। এছাড়া শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মের আল্পনাও আঁকা হয়। নতুন ধানে লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরে দেওয়া হয়। ধানের শীষকে মুকুটের মতো বানিয়ে লক্ষ্মীর পাশে দেওয়া হয়। সব বাড়িতে এদিন নিরামিষ খাওয়া হয়।

মহিলারা রাত্রে মুড়ি, রুটি বা পিঠে ইত্যাদি শুকনো খাবার খান। অগ্রহায়ণ ও পৌষ দুমাস প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর বিশেষ পূজা ও আনুষঙ্গিক নিয়ম পালিত হয়ে থাকে। রাত্রে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়া ও শোনার নিয়ম এই ব্রতের অঙ্গীভূত। জনজাতিদের বিশ্বাস লক্ষ্মীদেবী রাত্রে আকাশ পথে ঘুরে ঘুরে তাঁর প্রতি কোনো কোনো গৃহস্থ কেমন শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করেছেন, তা দেখেন। যাঁর বাড়িতে তাঁর মাহাত্ম্য পাঠ শুনতে পান সেই পরিবারের প্রতি বিশেষ সদয় হন ও তাঁদের ধন সম্পদ দান করেন। এই দেবীর কৃপায় মাঠে ভালো ফসল ফলে।

৫। **সরস্বতী দেবী** ঃ- বঙ্গ সংস্কৃতির মতোই সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের বিবিন্ন স্থানে সরস্বতী দেবীর পূজা হয়ে থাকে। মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়। এটি একটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। বিদ্যার চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেবী সরস্বতীর আরাধণা এখন টোল, চতুষ্পাঠী ও এখানকার বিদ্যালয় থেকে ঘরে ঘরে এমনকি বারোয়ারীতে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে দেবী সরস্বতীর পুজোর আয়োজন হয়। সন্ধ্যায় বাড়ীর মহিলারা দল বেঁধে দেবীর প্রতিমা দেখতে, সন্ধ্যা আরতি দেখতে বেরোন। এদিন সারা এলাকা জুড়ে উৎসবের সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি আরণ্যক জাতীর লোকেরা এ পুজোয় অংশ নেন। মূলত শিক্ষার্থীদের অতি গুরুত্তপূর্ণ দেবী হলেন সরস্বতী। তাই তারা সকলে মিলে ঘটা করে দেবী সরস্বতীর পূজার্চনা করে থাকে।

৬। **শীতলা দেবী** ঃ- শীতলা পূজা এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বার্ষিক উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। শীতলা দেবী কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের দেবী। এই বিশ্বাসে বিভিন্ন গ্রামে দেবী হিসেবে তাঁর মন্দির আছে ও নিত্য পূজার স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। যেখানে মন্দির নেই সেখানে ঘট তুলে ও শোলার পটে দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। বিশেষ রোগের আক্রমণেও দেবীকে সন্তুষ্ট করতে পূজা করা হয়ে থাকে। গ্রামের পূজোয় সব পরিবারে সেদিন দুপুরে রান্না বন্ধ রাখা হয় ও নিরামিষ খেতে হয়। দেবীর প্রসাদ সকলের বাড়ীতে পাঠানো হয়। কোনো কোনো পরিবারেও শীতলার বার্ষিক পূজা হয়ে থাকে। শীতলা পূজা উপলক্ষ্যে গায়েনের দল মঙ্গল গান করেন।

৭। **বিশ্বকর্মা পূজা** ঃ- ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা হয়। ইনি যন্ত্রের দেবতা বলে পূজিত হয়ে থাকেন। এঁকে স্বর্গের স্থপতিরূপে মান্য করা হয়। ইনি বৈদিক দেবতা রূপে পরিচিত। ঋক্‌বেদের দশম মন্ডলে ৮১ ও ৮২ নং সূক্তে এই দেবতার পরিচয় দেওয়া হয়েতে। কালে কালে জীবন যাত্রার নানা স্তরে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষিতে ও যন্ত্রের ব্যবহারে

ইনি প্রায় ঘরে ঘরে ঐ দিন পূজিত হন। একদা কামার, স্যাকরা প্রভৃতি কারিগর শিল্পীদের মধ্যে পূজিত হতে হতে যন্ত্রকর্মী সমাজের বৃদ্ধি ও কলকারখানার বিস্তারে ইনিও সমাজের ব্যপক অংশের পূজা লাভ করছেন।

৮। **শিব পূজা** ঃ- দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবর্তী সুবর্ণরেখার নদী তীরবর্তী অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেন মহাদেব বা শিব। অনার্য বা বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হলেন শিব। বছরের বিভিন্ন সময়ে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাকযমকপূর্ণ ভাবে সমারোহে শিব পূজা অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজন, শিব চতুর্দশী তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। নদী তীরবর্তী এলাকার প্রতিটি স্থানে শিব পূজাকে কেন্দ্র করে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঝাড়খন্ডের অন্তর্গত বহড়াগোড়া থানার চিত্রেশ্বরের মন্দির, পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরের ২নং থানার চোরচিতা গ্রামের চোরেশ্বরের মন্দির, নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত রামেশ্বরের ও পাতিমা গ্রমের কুচলেশ্বরের মন্দির, উত্তর বালেশ্বর জেলার অন্দর্গত ভোগরাই থানার ভূষণ্ডেশ্বরের মন্দির, চন্দনেশ্বরের মন্দির এ প্রসঙ্গে নামের উল্লেখ করা যেতে পরে। জনজাতি তথা বঙ্গ সমাজে মহাদেব কে স্বর্গের দেবতাদের পুরোহিত বলে গণ্য করা হয়।

৯। **গঙ্গাদেবী** ঃ- সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে গঙ্গা পুজার ব্যাপক প্রচলন মৎসজীবি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ঝড়, ঝঞ্জা, হিংস্র জীবজন্তু, আকস্মিক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন দেবী গঙ্গা। তাছাড়া জন সমাজের কল্যাণদাত্রী দেবী গঙ্গাকে মহাসমারোহে পূজা করা হয় এই অঞ্চলে। এই উপলক্ষ্যে বছরে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঝাড়খন্ডে ডোমজুড়ীতে এই দেবীর পূজা হয়ে থাকে। এতে কেওট ও ধীবর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

১০। **ওলাবিবি** ঃ- এই অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দেবী হলেন ওলাবিবি। বছরের বিভিন্ন সময়ে নানান উপচারে সাজিয়ে তাঁর আরাধানা করা হয়। কথিত আছে, কোনো মারাত্মক ব্যাধি, (বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি) থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করার জন্যই এই দেবীর উপাসনা করা হয়।

১১। **দ্বারাশুনী দেবী** ঃ- ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকার এক লৌকিক দেবী হলেন মা দ্বারাশুনী। এই দেবী সারা বছর ধরে সমানভাবে পূজিত হন। অন্য যেকোনো পুজোর আগে মা দ্বারাশুনীর পুজো করতে হয়। তবে উল্লেখযোগ্য হল- জৈষ্ঠ্যমাসের সংক্রান্তিতে ও পৌষমাসের সংক্রান্তিতে আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে মহাসমারোহে এলাকার লোকেরা এর পুজো করে থাকেন। গ্রাম থানে ছলন দেওয়া ও পাঁঠা বলিদান এই পুজো উপলক্ষ্যে একটি প্রচলিত রীতি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর ২নং থানার চোরচিতা অঞ্চলের অন্তর্গত ভামাল গ্রামে এই দেবীর পূজো উপলক্ষ্যে গ্রাম থান ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়াও এতদ্ অঞ্চলে জনজাতিদের মধ্যে থাকাল, রঙ্কিনী, যুগনী, ডাকাই বুড়ি, বড়াম, কালামুহী, বিলঝাঁপড়ি বেনেবুড়ি ও মেকিবুড়ীর পূজো আড়ম্বরে পালিত হয়। তেমনি ভাবে এলাকার মুসলিম সমাজে সিনি ও ভানসিং এর পূজা হয়ে থাকে। এই এলাকায় চৈতন্য মহাপ্রভুর দারুময় মূর্তি সম্বলিত কয়েকটি খ্যাতনামা মন্দির আছে। এছাড়া ব্যাক্তিগতভাবে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কৃষ্ণের পাথরের মূর্তিও পূজিত হয়। এঁদের নিয়ে মহোৎসবের আয়োজন প্রয় সারা বছর ধরেই চলে। চৈতন্য মূর্তির পূজা এলাকায় চৈতন্য দেবের ব্যাপক প্রভাবের কথাই স্মরণ করায় । বিভিন্ন ধরনের বিপদে উদ্ধারের জন্য, জটিল রোগ ব্যাধি, মামলা মোকদ্দমায় সাফল্য কামনায়, পিতা-মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে অন্নভোগ দেওয়া হয়। ঐ দিন মাহাপ্রভুর প্রসাদ শুধু নিমন্ত্রিত জনকেই নয়, অনাহুত সবাইকে বিতরণ করাই নিয়ম। মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণে উচ্চবর্ণ - নিম্নবর্ণ ভেদা-ভেদ করা হয় না। সাধারনতঃ কৃষি প্রধান এলাকায় ফসল তোলার পর থেকে পুনরায় চাষের সূচনার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মহোৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। গৃহস্থ নতুন বাসগৃহ তৈরী করলে, গৃহ প্রবেশ উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে আনিয়ে ঘরে পূজা করেন। যে কোনো মঙ্গল কর্মে ঘরে মহাপ্রভুকে আনা পবিত্র কাজ বলে বিশ্বাস।

সময়ের প্রবাহমানতায় এই প্রান্তবর্তী এলাকার স্বাতন্ত্র্য আর থাকছে না। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই অঞ্চলেও ধ্যান ধারণা, উৎসব অনুষ্ঠানের রূপান্তর ঘটেছে। তবে এই অঞ্চল মূখ্যতঃ কৃষি নির্ভর, স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিভিত্তিক উৎসব

অনুষ্ঠান এই এলাকায় তখনই মুছে যায়নি। পুরানো দিনের আয়োজন আধুনিক রূপ পাচ্ছে। কোথাও বা নূতনত্বের সংযোজন ঘটেছে। পুরানো ছড়া-গান-পাঁচালী এখন আগের মতো গুরুত্ব পায় না। যন্ত্র নির্ভর সভ্যতার অগ্রগতি শ্রম নির্ভর বা শ্রম কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে বশ করছে। তবু এই সব এলাকার প্রাচীন আচার আচরণ এলাকার মানুষদের ঐতিহ্য চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে বলে বিশ্বাস।

কালের প্রবাহে আলোচ্য অঞ্চলেও অনেক বদল হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় সীমান্তের গন্ডগ্রামগুলি ও রাজধানী শহর, এমনকি বিশ্বের সমৃদ্ধ শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলির চিত্র দেখার সুযোগ পাচ্ছে। গ্রামের ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট বদলেছে। এ সব সত্ত্বেও মানুষের বিশ্বাসের জগতে সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসেনি। পোশাক বদলেছে। খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির দেওয়ালের ঘর এখন অনেক কমে গিয়েছে। ঝুপড়িগুলো সরকারী অনুদানে, কোথাও নিজ সামর্থ্যে ইঁটের দেওয়াল, সিমেন্টের মেঝে ও টিন বা অ্যাজবেস্টাস এর ছাউনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্লাস্টিক ফাইবারের আসবাবপত্র এখন সহজলভ্য, ফলে মেঝেতে মাদুর পেতে বসার দিন এখন আর নেই বলা যায়। শোয়ার বিছানা মেঝেতে প্রায় হয়না। জীবনযাত্রার এই সবকালোপযোগী পরিবর্তনের দৃশ্যের পাশে পুরাতন বিশ্বাস সংস্কারের চিত্র চোখে পড়ে। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বোধ হয় এ ভাবেই তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে। দেব-দেবীর পূজার্চনা বেড়েছে। বেড়েছে পূজার উপকরণ ও আড়ম্বর। পূজা উপলক্ষ্যে শুধু মন্ডপ সাজানো নয়, গৃহকেও সুন্দরভাবে সাজানো হচ্ছে। নিত্য পূজা, ঘরে একটি দেব মূর্তি বা দেবতার চিত্রলিপি রেখে নিয়মিত পূজার আয়েজন বেড়েছে। ব্বাঞ্চলের অস্ট্রিক গোষ্ঠীভূক্ত জনসমাজ ও তাঁদের উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অলঙ্করণে ও আসবাবে আধুনিকতা এনেছেন। সর্বত্রই দেব নির্ভরতা, অলৌকিক বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস সমান ভাবে বর্তমান। বাড়ীর সামনে তুলসী মঞ্চ নির্মাণ, নিয়মিত সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো, শাঁখ বাজানো প্রভৃতিতে বিশ্বাস এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয়। শাঁখের শব্দ মঙ্গল সূচক বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে।

সকালে ছড়া দেওয়া, গোবর জলে গুলে ঘরের চারপাশে ছিটানো এখনও বর্তমান। সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়ার আগে জায়গা-গুলিতে জল ছিটানো হয়। এমন কি মেঝের বদলে যেখানে সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে রয়েছে, সেখানে সমান ভাবে জল ছিটানোর রীতি বর্তমান।

৪। <u>বিনোদন</u>

(লোকক্রীড়া, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, লোকবিশ্বাস)

(ক) লোকক্রীড়া গুলি হল - অষ্টা, আশপাশ, আব্দুল, আঁইসাবাটি, ইজিকম্যাজিকে, ইকরিমিকরি, এক্কাদোক্কা, কাঁঠালচোর, কড়িখেলা, কাতিখেলা, কিত-কিত, কুমির-কুমির, গাই-বাছুর, কানামাছি, রিং, চামচিকে, তালগাছ, দাঁড়িয়া, পঞ্চাশচোর, পতর খেলা, বউবসন্ত, বাঘছাগল, বুড়িছোঁয়া, মাংসচুরি, লুডোখেলা, রাম লক্ষণ, কদৌকদৌমাজা, সাতখরিয়া, আলিখেলা ইত্যাদি।

(১)**<u>কানামাছি</u>** ঃ- কানামাছি দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া। সাধারণভাবে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে এটি একটি আকর্ষণীয় খেলা। এই খেলাতে অংশগ্রহণ কারী কোনো একজনের চোখকে কাপড় দিয়ে বেঁধে দোওয়া হয়। অন্যান্য অংশগ্রহণ কারীরা তাকে বিভিন্ন ভাবে ভেলকি দেখিয়ে খেলানোর চেষ্ঠা করে থাকে। চোখ বাঁধা অবস্থায় এই অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে ছোঁয়ার চেষ্ঠা করে এবং যাকে ছুঁয়ে ফেলবেই সেই প্রতিযোগীর চোখে পুনারায় কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়। এই ভাবে লোকসমাজ তথা জন জাতিদের মধ্যে এই খেলাটি আটপৌরে সাজে খেলার প্রচলন রয়েছে।

২। **<u>লুকোচুরি</u>** ঃ- সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতির অবসর বিনোদনের আর একটি গুরুত্ত্বপূর্ণ মাধ্যাম হল লুকোচুরি খেলা। এই খেলায় ছোটো ছোটো শিশুদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। বাড়ীর আনাচে কানাচে, চিলেকোঠা, গাছের কোটরে কিংবা অন্য কোনো স্থানে অংশগ্রহণকারীরা লুকিয়ে আড়াল থেকে অন্যদেরকে ডাক দিতে থাকে। লুকিয়ে অংশগ্রহণকারীকে বা অংশগ্রহণকারীর দলকে খুঁজে ফেললেই খেলার সমাপ্তি ঘটে। আধুনিক মানব সভ্যতার উন্নতি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ধীরে ধীরে এই ধরনের খেলা জনজাতি সমাজ থেকে লুপ্ত হতে বসেছে, যা সমাজের কাছে খুবই ক্ষতিকারক।

৩। **<u>মাংসচুরি</u>** ঃ- সুবর্ণরেখা নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা হল মাংসচুরি। এই খেলাতে কোনো

চকের সাহয্যে বা লাঠির সাহায্যে চারটি ঘরের দাগ কাটা হয়। চারটি ঘরে চার জন অংশগ্রহণকারী দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝখানে একজন দাঁড়িয়ে থাকে। তার পায়ের তলায় পাথর খন্ড বা নুড়ি চারটি রাখা থাকে। সেই নুড়ি গুলি বা পাথর গুলিকে চারজন অংশগ্রহনকারী যে কোনো প্রকারে চুরি করে একটি ঘরের মধ্যে দলবদ্ধভাবে আবস্থান করলে সেখনেই খেলাটির সমাপ্তি ঘটে। এতদ্ অঞ্চলে আজও খেলাটির প্রচলন রয়েছে।

৪। **<u>পতরখেলা</u>** ঃ- এই অঞ্চলের শিশুদের কাছে আর একটি আকর্যণীয় খেলা হল পতরখেলা। এই খেলায় অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ১০ বা ১৫ জন। এতে একটি চারকোণা আকৃতি বিশিষ্ট একটি ঘরের দাগ কাটা থাকে। সেই দাগের ভিতরেই সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা দাঁড়িয়ে থাকে এবং বাইরে একজন থাকে। ঘরের ভেতরে থাকা অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নেরভিত্তিতে বাইরের জন বিভিন্ন গাছ-পালার লতাপাতা নিয়ে আসতে বলে।

সেইমতো সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা ঘর থেকে বেরিয়ে সেই সব গাছের সন্ধানে ছুটে চলে। অন্য দিকে বাইরে থাকা অংশগ্রহণকারী তাদের প্রত্যেক কে ছুঁয়ে ফেলার চেষ্টা করেতে থাকে। এই ভাবে আটপৌরে সাজ ও খেলার সামগ্রী ভিত্তিতে কিছু সময় ধরে এই খেলা চলতে থাকে। সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে এই খেলার সমাপ্তি ঘটানো হয়।

৫) **<u>আলি খেলা</u>** ঃ- সুবর্ণরেখাতীরবর্তী অঞ্চলের শিশুদের কাছে অবসর সময়ে বিনোদনের আর একটি মাধ্যম হলো আলি খেলা। এর অন্য নাম মান্য চলতি বাংলায় মার্বেল গুটি খেলা। এই খেলাতে অংশগ্রহণকারী এককভাবে বা দলগত ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীরা মার্বেল গুটি ছুঁড়ে থাকে। সেই লক্ষ্য অনুযায়ী অন্য একটি মার্বেল গুটিতে ধাক্কা খেলে অংশগ্রহণকারী হাতের কনুই বা কব্জির সাহায্যে যত দূর পর্যন্ত মার্বেল গুটি যায় সেখান থেকে অংশগ্রহণকারীদের দল ফেরানের চেষ্টা করে। এই খেলার কেন্দ্রে থাকে একটি বড় মাপের গর্ত। সেই গর্তে মার্বেল গুটিকে হাতের কনুই বা কব্জির সহযোগে ফেলতে পারলেই অংশগ্রহণকারী বেশ লাভবানহয়। এই ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এই খেলা চলতে থাকে। খেলার কোনো নির্দিষ্ট সময় বা দিনক্ষণের উল্লেখ থাকে না। জনজাতি সমাজের আগ্রহ হেতু এই ধরনের খেলা শুরু হয়ে থাকে।

৬) **কড়ি খেলা** ঃ- সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর একটি প্রচলিত আকর্ষণীয় লোকক্রীড়া হল কড়ি খেলা। বিয়ের পর বর কনেকে কড়ি খেলতে দেখা যায়। এই কড়ি খেলা আদিবাসী সমাজ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে অনেকে স্বীকার করেন, এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলতে হয় যে, আদিম সমাজ কোন বস্তুর আকার প্রকারগত সাদৃশ্য দেখে ঐ ধরনের ভাবনা চিন্তা করত। স্ত্রী চিহ্ন সূচক আকৃতির জন্য কড়ি আদিম সমাজে সম্পদ বলে গণ্য হোত । কোনো কিছু লেনদেন-এর জন্য কড়িই ব্যবহার হতো। পরে উর্বরতার প্রতীক বলে গুটি খেলায় দানের খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে । ভাগ্যও নির্দেশ হয় সেই সঙ্গে। কড়ির আকার প্রকারগত সাদৃশ্যের জন্যই যে আদিম সমাজে এরকম যাদু সংস্কার গড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, মোট কথা কড়ি আদিম গোষ্টীর পূর্ব পুরুষদের যৌন প্রতীকী চিন্তা ধারার ঐতিহ্য বহন করে আসছে । মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারা চিহ্ন এভাবেই প্রবাহিত হয়ে আসছে। বর কনের কড়ি খেলা হয় কনের বান্ধবী ও এয়ো স্ত্রীদের সামনে। তারাই হার জিতের হিসাব রাখে। প্রত্যেকেই কনেকে জেতাবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং বরও হারতে থাকে । উদ্দেশ্য একটা নতুন সংসারের সবাইকে জয় করার আত্মবিশ্বাস কড়ি খেলার ভিতর দিয়ে কনের মনে আনা। এইজন্যই কড়ি খেলা বিবাহ অনুষ্ঠানে একটা গুরত্বপূর্ণ লোকাচার।

৭। **দাঁড়িয়া** ঃ- এই অঞ্চলের আর একটি গুরত্বপূর্ণ খেলা হল দাঁড়িয়া। এই খেলায় অংশগ্রহণকারীর নিদিষ্ট সংখ্যা থাকে না। খেলাটি মূলত বর্ষাকালেই হয়ে থাকে। কোনো একটি মাঠের চারিদিকে ৫-৬টি ঘর কাটা থাকে। প্রতিটি ঘর দুটি সারিতে বিভক্ত থাকে। সারির লম্বা লাইনে একজন করে প্রতিটি ঘরের সামনের ছোটো লাইনের খেলা শুরু হওয়ার আগে সবাই দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ধাপে ধাপে এক একটি ঘর পেরিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে দলবদ্ধ ভাবে অবস্থান করলে খেলার সমাপ্তি ঘটে। অংশগ্রহণকারীদের দল একঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার সময় লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি তাদেরকে আটকানোর চেষ্ঠা করে। সেই সব অংশগ্রণকারীদের ছুঁতে না পারলে খেলাটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয়। আধুনিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে ধীরে ধীরে এই ধরনের খেলা বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে।

৮। **বাঘ-ছাগল** ঃ- বঙ্গ সমাজের দাবা খেলার অনুরূপ হল বাঘ-ছাগল। ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত খন্ডের অঞ্চলগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত এই খেলা। এতে দুজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে থাকে। খেলার সামগ্রী হিসেবে কাঠি ও নুড়ি ব্যবহার করা হয়। যেকোনো একটি জায়গায় বাঘ-ছাগল খেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মে

ছক কাটা থাকে। সেই ছকের মধ্যেই গুটিকে বা নুড়িকে ছাগল বলে ও কাঠিগুলিকে বাঘ বলে মনে করা হয়। কিছু সময় ধরে এই ধরনের খেলা হয়ে থাকে। কথিত রয়েছে এর মধ্য দিয়ে মেধার উৎকর্ষকে বিচার করা হয়।

৯। **<u>কাঁঠালচোর</u>** ঃ- সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলের শিশুদের কাছে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া হল কাঁঠালচোর। এই খেলার কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বা সময় থাকে না। খেলাটির বিশেষত্ব হল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেকার কোনো একজনকে কাঁঠাল গাছ বলে ধরা হয়। সেই গাছের চারিদিকে শিশুরা ঐ ব্যক্তির হাত পা ধরে কাঁঠাল সেজে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। ঐ

কাঁঠাল গাছের মালিক (অন্য একজন অংশগ্রহণকারী) এসে এক একটি কাঁঠাল প্রত্যহ তুলে নিলে সেখানে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তখন উদাস মনে সেই মালিক কাঁঠাল গাছটিকে জল সেচন করে এক সময়ে কেটে ফেলে। এই ভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

১০। **<u>কুমির-কুমির</u>** ঃ- এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর একটি প্রচলিত খেলা হল কুমির-কুমির। খেলাটি মূলতঃ নদী, পুকুর বা জলাশয়ে হয়ে থাকে। এই খেলার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকলেও ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই আনন্দসহকারে অংশগ্রহণ করে থাকে। জলের মধ্যে কোনো একজন অংশগ্রহণকারী কুমির সেজে অন্য জনের পায়ে টান দিতে থাকে। সেই অংশগ্রহণকারীর দল কুমিরকে ধরে ফেললে সেই খানেই খেলার সমাপ্তি ঘটে।

১১। **<u>কিত-কিত খেলা</u>**ঃ- এই ধরনের খেলা প্রধানত সুবর্ণরেখার তীরবর্তী গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও কেশিয়াড়ী থানায় বেশি প্রচলিত। বর্ষাকালেই এই ধরনের খেলার প্রচলন দেখা যায়। অংশগ্রহণকারীর দল মূলতঃ মেয়েরাই। এই খেলাটি একক ভাবে বা দলগত ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। রাস্তার মাঝখানে বা খামারে সারিবদ্ধ ঘরের সমন্বয়ে দাগ কাটা হয়। খেলার সামগ্রী হিসেবে কোনো চ্যাপ্টা আকৃতি বিশিষ্ট টালি বা পাথর খন্ডকে ব্যবহার করা হয়। পায়ের সাহায্যে একঘর থেকে অন্য ঘরে পাস দেওয়ার সময়ে কোনো দাগকে অংশগ্রহণকারীরা স্পর্শ করে না। দাগের মধ্যে পা কিংবা, সেই চ্যাপ্টার মত টালি খন্ডটি ছুঁয়ে ফেললেই খেলার সমাপ্তি হয়।

১২। **<u>লুডো</u>** ঃ- বঙ্গ সমাজ তথা আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি জনপ্রিয় খেলা হল লুডো। এই খেলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা চার। একক ভাবে বা দলগত ভাবে এই খেলাটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। খেলার সামগ্রী হিসাবে একটি কাগজের ছক কাটা চারটি ঘর থাকে ও চার ধরনের রঙের চ্যাপ্টা আকৃতির চারটি করে মোট ১৬টি গুটি থাকে। সেই গুটিগুলিকে অংশগ্রহণকারীরা ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট ঘরে বাধা বিপত্তি এড়িয়ে পোঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ কাজে সাহায্য করে আর একটি ঘনকের আকৃতি বিশিষ্ট লুডো ছক্কার গুটি। সেই গুটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে। সেই সব সংখ্যাকে অনুসরণ করেই প্রতিযোগীদের দল লুডো খেলা করে থাকে।

১৩। **<u>ইকরি-মিকরি</u>** ঃ- এতদ্অঞ্চলের জনগোষ্ঠির শিশুদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকক্রীড়া হল ইকরি-মিকরি। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না। খেলাটি হাতের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। শিশুদের আগ্রহ, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের সমবয়সীর মধ্যে তাদের খেলতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে একটি শ্লোক জনসমাজে প্রচলিত - “ইকরি মিকরি চামচিকরি কইমকাকর।”

১৪। **<u>কদৌ কদৌ মাজা</u>** ঃ- দক্ষিণ পশ্চিম, সীমান্ত বাংলার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা হল কদৌ কদৌ মাজা। এই খেলাটি মূলত শিশুদের ঘুমপাড়ানিয়া গানের আকারে পরিবেশিত হয়। মা তাঁর শিশু সন্তান বা কন্যাকে খেলার ছলে এই ধরনের ছড়া পরিবেশন করে থাকেন। শিশুটির হাতের উপর মা তার নিজের হাতকে রেখে মুখে মুকে ছড়া কাটতে থাকেন। এই ভাবেই খেলাটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। শিশু সন্তান বা কন্যা তাঁর মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়লেই খেলাটির সমাপ্তি ঘটে।

খ) সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকায় প্রচলিত লোকনৃত্য গুলি হল কাঠিনাচ, পাতানাচ, মুখোশনাচ, ছৌনাচ, করম নাচ ইত্যাদি।

১। **<u>কাঠি নাচ</u>** ঃ- পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীদের অত্যন্ত জনপ্রিয় নাচ। প্রত্যেকেই একসঙ্গে একহাতের লাঠিদিয়ে তার পাশের নৃত্যকারীকে আঘাত করে। আবার অন্য হতের লাঠি দিয়ে প্রত্যাঘাতকারীর আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এই কাজ অতি দ্রুতলয়ে চলতে থাকে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে বাজে মাদল, কাঁসি। নৃত্যকারী কখনোও মাটিতে অর্ধেক বসে, কখনো সোজা দাঁড়িয়ে ক্রমাগত নৃত্য ভঙ্গিতে থেকে আঘাত ও প্রত্যাঘাত করে।

আশ্বিন মাসে দূর্গাপূজো উপলক্ষ্যে এবং মকর সংক্রান্তির পরবর্তী সময়ে সূবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে কাঠিনাচের প্রচলন দেখা যায়। দূটি হাতে কাঠি নিয়ে বিভিন্ন তালে পরস্পরকে আঘাত করতে করতে চক্রাকারে ঘূরতে থাকে। কাঠি নাচের সময় গান গাওয়া হয়। গান ও নাচ দূটি একসঙ্গে চলতে থাকে।

বাংলার ব্রতচারী নাচের সঙ্গে কাঠিনাচের প্রচলন রয়েছে। পরনে সাদা ধূতি ও গেঞ্জি এবং কোমরে লাল কোমরবন্ধ পরে নৃত্যকারী বৃন্দ গানের তালে তালে কাঠি নাচ করে।

কাঠিনাচ প্রধানত গোষ্ঠীবদ্ধ নাচ। নাচের তালের সঙ্গে শরীরের দোলায়িত ছন্দে অপূর্ব সৌন্দর্যের সূচনা করে। কোনো কোনো অঞ্চলে নৃত্যকারীরা নারীবেশে গোপিকা সেজে এই নাচে অংশ গ্রহণ করে। মূসলমানদের তাজিয়া খেলার মধ্যে দৈত্য কাঠিনাচ দেখা যায়। বাজনার তালে তালে পরস্পর কাঠিতে আঘাত করে নাচ করতে থাকে।

২। **<u>পাতা নাচ</u>** ঃ- কাঠিনাচের উপজাত আরও একধরনের নাচ আছে তাকে পাতা নাচ বলে। কোথাও কোথাও বিশেষত সূবর্ণরেখা তীরবর্তী পূরুলিয়া সন্নিহিত অঞ্চলে পাতা নাচের প্রচলন দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠিনাচের বিষয়ই অরো একটূ তরল জীবনাশ্রয়ী হয়ে পাতা নাচে পরিণত হয়েছে। অনেক জায়গাতেই কাঠিনাচের নর্তকেরাই ঐ একই পোষাক পরে। কেবল লাঠি গুলি ছেড়ে দিয়ে হরিণ শিকার কিংবা ক্ষেতে হাল বলদ চালনা ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে তরল কৌতূক রসের আশ্রয়ে নাচতে থাকে।

৩। **<u>ছৌনাচ</u>** ঃ- ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য নাচ হল ছৌনাচ, এই নাচ মূলত সূবর্ণরেখা তীরবর্তী পূরুলিয়া জেলার সমগ্র অংশে জনপ্রিয়

নাচ। ছৌ আবশ্যিকভাবে মুখোশ নৃত্য। বাঙালীর স্বাভাবিক যে মূর্তি নির্মাণ কুশলতা তার সংযোগে ভারতীয় পুরাণের বিভিন্ন দেবদেবীর, দৈত্য-রাক্ষস, নর-বানর, চরিত্র গুলির অনুরূপ মুখোশ তৈরী করা হয়। এগুলি বর্ণসুষমা এবং স্বাভাবিকতা প্রথম দর্শনেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নাচের উৎসমূলে যে শিব-গাজনের প্রভাব তা একপ্রকার স্বীকৃত। তবে এই নাচের তাল ভঙ্গিমা, রস নিষ্পত্তি লক্ষ্য করে কেউ কেউ একে যুদ্ধ নৃত্য বা সৈন্য বাহিনীর আরাম স্থল ছাউনির নৃত্য বলতে চান। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে লক্ষ্যণীয় যে এই জেলায় নাচনি নামে এক ধরনের লোকনৃত্য আছে। তার কতকগুলি বৈশিষ্ঠ্যের দিকে খুব সচেতনভাবে নজর দিলে দেখা যাবে যে ছৌনাচের উৎস পরিকল্পনায় উক্ত নাচনি নাচের কিছু কিছু প্রভাব রয়েছে। তার সঙ্গে আবার এই অঞ্চলের সুপরিচিত পাইক বা নাটুয়া নাচের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

চৈত্র মাসের শেষ থেকে গোটা আষাঢ় মাস পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন ভালো করে বর্ষা না নামে ততদিন ছৌ-নাচের একটা না একটা আসর এতদ্ অঞ্চলের কোনো কোনো গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। ছৌনাচ একটি পূর্ণ রাত্রির নৃত্যানুষ্ঠান। এর বিষয় রামায়ণ, মহাভারত কিংবা কৃষ্ণলীলা। সাধারণত নিম্নাঙ্গে মালকোঁচা মেরে পরা ধূতি বা কোথাও ঘূঠনা এবং মুখে মুখোশ এই হচ্ছে ছৌনাচের আদি পোশাক। তবে সম্প্রতি যাত্রার বর্নাঢ্য পোশাক ব্যবহারে চল হয়েছে। এই নাচের উদ্দামতা, বীর ভাব চরিত্রানুযায়ী স্বাভাবিক মুখোশ ও দৃঢ় বন্ধ কাহিনী একে একে উচ্চাংশে লোকনৃত্য নাট্যের মর্যাদা দান করেছে। ছৌনাচের প্রম্ভে আবশ্যক ভাবে গনেশ বন্দনা হবেই হবে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার সন্নিকটস্থ ঝাড়খন্ডের সরাইকেলায় এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় ও দুই পৃথক দুই ঘরানার ছৌনৃত্য প্রচলিত রয়েছে।

৪। **<u>মুখোশ নাচ</u>** ঃ- মুখকোশ শব্দ থেকে মুখোশ শব্দটি উৎপন্ন। এর অর্থ মুখাবরক, মুখচ্ছদ, ছদ্ম মুখ, নকল মুখ ইত্যাদি অর্থে মুখোশ শব্দ ব্যবহৃত হয়। মুখোশ পরিহিত লোকনৃত্য ধারার অন্যতম নাচ এই মুখোশ। মুখোশ নানা উপকরণে নির্মিত হয়। কাঠ, বাঁশ, শোলা, মাটি, হাড় ও কাগজ মন্ডে এই মুখোশ তৈরী হয়। মূলত বাংলা তথা সীমান্তবর্তী এলাকার আদিবাসী ও লোকসমাজে এই ধরনের নাচের প্রচলন রয়েছে।

গ) লোকশিল্প গুলি হল পিঠেপুলি যেমন চিতোপিঠে, পড়াপিঠে, কাকরাপিঠে, চকলিপিঠে, হাড়িমহা, মাংসপিঠে, গঁদপিঠে, পুরপিঠে, লাউপিঠে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, তিলনাড়ু, বাদাম নাড়ু, খই নাড়ু ইত্যাদি। পাটের দড়ি, বিভিন্ন সুতোর তৈরী হাতপাখা, কাশের ঝুড়ি, খেজুর পাতার চাটিয়া, বিরি-বড়ি, মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন ধরনের সুতো দিয়ে তৈরী করা জাল বিশেষ ইত্যাদি।

১) **দড়িশিল্প** ঃ- আসন, সন, কাঙ্গুরা, পাটের দড়ি, বিভিন্ন সুতোর তৈরী হাত পাখা, সুতোর আসন, কাশের ঝুড়ি, এছাড়াও খেজুর পাতার চাটিয়া বিরির বড়ি এই অঞ্চলে বিখ্যাত।

বড়ি শিল্প

২) **কাঁথা শিল্প** ঃ- সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত লোকশিল্প হল কাঁথা শিল্প। বিশেষত মহিলারাই এই শিল্পে নিযুক্ত। বিভিন্ন রংবেরঙের সুতো ও কাপড় দিয়ে এই কাঁথা তৈরী হয়। সুঁচ দিয়ে সেলাই করার সময় বিভিন্ন রকমের নকশা তৈরী করা হয়। অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে পরিবারের নারী মহলে এই ধরনের শিল্পের বিকাশ ঘটে। এছাড়াও এতদ্ অঞ্চলে নানান কুটির শিল্প জাতীয় লোক শিল্পের প্রচলন রয়েছে। যেমন এলাকার মাহালি ও ডোম সম্প্রদায়ের হাতে তৈরী করা বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি বোনা কিংবা বিভিন্ন সম্প্রদায় হাতের তৈরী করার বড়ি শিল্প খুবই উল্লেখযোগ্য নিম্নবর্ণের সাঁওতাল ,মুন্ডা, ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে দারু শিল্পের খুবই প্রচলন রয়েছে।

ঘ) লোকবিশ্বাস ঃ-

এতদ্ অঞ্চলে এই ধরনের লোক লিশ্বাস গুলি প্রচলিত-

১। কালো বিড়াল দেখলে অশুভ লক্ষণের প্রকাশ।

২। টিকটিকটির ডাক শুভ লক্ষণের চিহ্ন প্রকাশ।

৩। পরীক্ষার্থীদের ডিম খেয়ে যেতে নেই।

৪। পূজা-পার্বণের সময় আমিষ জাতীয় খাদ্য খওয়া নিষেধ।

৫। সাপ কাটলে ওঝা বা গুণিনের কাছে যাওয়া।

৬। কোথাও কাজে বেরোনোর ক্ষেত্রে বার-তিথি নক্ষত্রের বিচার করা হয়।

৭। সমাজে পাঞ্জীর ব্যবহার এখনও সমানভাবে বর্তমান।

এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার

ক। এলাকার অধিবাসীদের সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সবধরনের জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছি।
খ। অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করে পুরুষানুক্রমে অনুসৃত তাদের ভাষা বৈচিত্র্য, আচার-আচরণের কথা যথাসাধ্য তুলে ধরা হয়েছে ।
গ। অধিবাসীরা তাদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে যেসব পূজ-পার্বণ করে আসছেন, দেবদেবীকে মেনে আসছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন এর উল্লেখ রয়েছে।
ঘ। এর পাসাপাশি এলাকাবাসীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ও কর্ম ধারা সূত্রে অনুসৃত বিশ্বাস-সংস্কারের পরিচয় আভাষিত করা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি ঃ-

১। বিশাই শঙ্কর; বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলবর্তী লোকজীবন ও সংস্কৃতি, দেজ অফসেট কোলকাতা; ৭৩, পৃ - ৬-৮।

২। বিশাই শঙ্কর; বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলবর্তী লোকজীবন ও সংস্কৃতি, দেজ অফসেট কোলকাতা, ৭৩, পৃ - ১১।

৩। মিশ্র যতীন্দ্র নাথ; দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা, পৃ. ১৯।

৪।গ্রিয়ারসন জর্য; Linguistic Survey of India.

৫। চট্টোপাধ্যয়, সুনীতি কুমার; বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ।

৬। সেন সুকুমার; ভাষার ইতিবৃত্ত।

৭। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ঃ- তথ্যদাতা, মুক্তিপদ দাস, দহমুন্ডা, গোপী - ১, পঃ মেদিনীপুর।

৮। ঘোষাল, ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁই রূপ, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়, কলি-৬৮, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ - ৫৭।

৯। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ(সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা, পৃ. ১৭।

১০। শ রামেশ্বর; বাংলা ভাষা বিজ্ঞান।

১১। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০২/০৮/২০১৫, তথ্যদাতা কার্তিক সরেন, কঙ্গাডাহি, গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

১২। হেমরম পরিমল সাঁওতালি ভাষা ও সাত্যের ইতিহাস। পৃ. - ১৪-১৬।

১৩। হেমরম পরিমল সাঁওতালি ভাষা ও সাত্যের ইতিহাস। পৃ. - ২২-২৬।

১৪। হেমরম পরিমল সাঁওতালি ভাষা ও সাত্যের ইতিহাস। পৃ. - ৩১-৩৪।

১৫। হেমরম পরিমল সাঁওতালি ভাষা ও সাত্যের ইতিহাস। পৃ. - ৩৮-৪১।

১৬। হেমর, পরিমল সাঁওতালি ভাষা ও সাত্যের ইতিহাস। পৃ. - ৪৬।

১৭। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৩/০৫/২০১২, তথ্যদাতা সনাতন টুডু, লাউদহ, সাঁকরাইল পঃ মেদিনীপুর।

১৮। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৩/০৫/২০১২, তথ্যদাতা সনাতন টুডু, লাউদহ, সাঁকরাইল পঃ মেদিনীপুর।

১৯। ঘোষাল ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়, কলি-৬৮, ডিসেম্বর ২০০৪। পৃ. - ৬৩

২০। ঘোষাল, ছন্দা; ঝাড়খন্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ ঢাকুরিয়, কলি-৬৮, ডিসেম্বর ২০০৪। পৃ. - ৭৯।

২১। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০২/০৪/২০১১, তথ্যদাতা অশ্বনী কারক, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

২২। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ৫/০২/২০১১, তথ্যদাতা পার্বতী মন্ডল, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।।

২৩। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ৫/০২/২০১১, তথ্যদাতা পার্বতী মন্ডল, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।।

২৪। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ৫/০২/২০১১, তথ্যদাতা পার্বতী মন্ডল, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

২৫। মিশ্র যতীন্দনাথ(সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৩০।

২৬। মিশ্র যতীন্দনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৩১।

২৭। মিশ্র যতীন্দনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৩২।

২৮। মিশ্র যতীন্দনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৩৪।

২৯। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ২/০১/২০১১, তথ্যদাতা পার্বতী মন্ডল, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৩০। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ২/০১/২০১১, তথ্যদাতা পার্বতী মন্ডল, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৩১। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ২/০১/২০১১, তথ্যদাতা পার্বর্তীমন্ডল, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৩২। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ২/০১/২০১১, তথ্যদাতা পার্বর্তী মন্ডল, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৩৩। মিশ্র যতীন্দ্র নাথ(সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৩৮।

৩৪। মিশ্র যতীন্দ্র নাথ(সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৪৩-৪৫।

৩৫। মিশ্র যতীন্দ্র নাথ(সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৪৩।

৩৬। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৫/০৪/২০১১, তথ্যদাতা সহদেব বিশুই, গোপী - ১, পঃ মেদিনীপুর।

৩৭। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৪/০৮/২০১২, তথ্যদাতা ভীম চরণ খাটুয়া, খড়িকাশোল, গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৩৮ । মিশ্র যতীন্দ্রনাথ(সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৪৪।

৩৯। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ(সম্পা)ঃ- দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ২৬।

৪০। মিশ্র, যতীন্দ্র নাথ(সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ২৮।

৪১। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৪/০৮/২০১২, তথ্যদাতা ভীম চরণ খাটুয়া, খড়িকাশোল, গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৪২। পালুই লক্ষীন্দর (প্রবন্ধ); সঞ্চয়ন পত্রিকা (২য় প্রয়াস), ভট্টর কলেজ দাঁতন পঃ মেদিনীপুর, মার্চ, ২০০৭।

৪৩। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০২/০৪/২০১১, তথ্যদাতা অশ্বনী কারক, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৪৪। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০২/০৪/২০১১, তথ্যদাতা আশ্বনী কারক, ভামাল গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৪৫। পালুই, লক্ষীন্দর (প্রবন্ধ); সঞ্চয়ন পত্রিকা (২য় প্রয়াস), ভট্টর কলেজ দাঁতন পঃ মেদিনীপুর, মার্চ, ২০০৭।

৪৬। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ(সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ১৯।

৪৭। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ২১।

৪৮। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৫৯।

৪৯। মিশ্রযতীন্দ্রনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৫৪।

৫০। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৫৬।

৫১। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৪/০৮/২০১২, তথ্যদাতা ভীম চরণ খাটুয়া, খড়িকাশোল, গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৫২। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৪/০৮/২০১২, তথ্যদাতা ভীম চরণ খাটুয়া, খড়িকাশোল, গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৫৩। বসু রায়শেখর; ভাষা মীমাংসা ও ভাষাতত্ত্ব।

৫৪। মিত্র সুবল চন্দ্র বাংলা ভাষা অভিধান।

৫৫। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৫২।

৫৬। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৫/০৪/২০১১, তথ্যদাতা সহদেব বিশুই, গোপী - ১, পঃ মেদিনীপুর।

৫৭। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৫/০৪/২০১১, তথ্যদাতা সহদেব বিশুই, গোপী - ১, পঃ মেদিনীপুর।

৫৮। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৫/০৪/২০১১, তথ্যদাতা সহদেব বিশুই, গোপী - ১, পঃ মেদিনীপুর।

৫৯। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৫৭।

৬০। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০৪/০৮/২০১২, তথ্যদাতা ভীম চরণ খাটুয়া, খড়িকাশোল, গোপী - ২, পঃ মেদিনীপুর।

৬১। মিশ্র, যতীন্দ্রনাথ (সম্পা); দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারা পৃ - ৫২।

৬২। বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ; বাংলা অবিধান।

৬৩। রায় যোগেশ চন্দ্র; বাংলা ভাষা ও অবিধান।

৬৪।বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্র; বাংলা অবিধানের রূপ রেখা।

৬৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ; বাংলা লোকসংস্কৃতির ধারা।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আধুনিক বৃহৎ-বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যে জনজাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য

সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকা অঞ্চল বর্তমানে তিনটি রাজ্যের সীমানা বরাবর অবস্থিত। ফলে এই অঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃতিতে মিশ্র রূপ লক্ষ্য করা যায়।[১] সভ্যতার অগ্রগতি ও নাগরিক সংস্কৃতির প্রাধান্যে সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ফলস্বরুপ জনজাতির লোকেরা প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ভাবে ভূলে গিয়ে আধুনিকের পথে পা বাড়িয়েছে। এই মতের ভিত্তিতে আধুনিক বৃহৎ বঙ্গ-সংস্কৃতির মধ্যে সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী জনজাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়েছি। তার সামগ্রিক পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বেশ কিছু পর্ব উৎসব এই এলাকার জনজীবনে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। গমা পূর্ণিমা বা ঝুলন পূর্ণিমা বৈষ্ণব সমাজের মান্য তিথি। এই উপলক্ষ্যে রাখী পরানোর আয়োজন রয়েছে। তাই এটি নাম রাখীপূর্ণিমা রূপেও পরিচিত। এদিন এই এলাকায় একটি বিশেষ দিন রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে । এই উপলক্ষ্যে জামাইদের শ্বশুর বাড়ীতে আমন্ত্রণ ও মর্যাদা লাভ , বঙ্গদেশে প্রচলিত জামাই ষষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমানে কিছুটা হ্রসপ্রাপ্ত হলেও গমা পূর্ণিমার মাহাত্ম্য আজও পুরোপুরি লুপ্ত হয় নি। দীপান্বিতা কালী পূজার পরদিন পড়িয়ন উপলক্ষ্যে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সাজানো, নতুন জামাকাপড় পরানোর রীতি আছে। বাদ্যকারেরা বাড়ী বাড়ী বাজনা বাজিয়ে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করে থাকেন। অন্যান্য বাঙালী জাতিগুলিও এতে যোগ দেয়। সেই সময়ে বাঁধনা পরব, গোবন্দনা উভয় সম্প্রদায়ের পালনীয় উৎসব। করম, জাওয়া, টুসু মূলতঃ এই অঞ্চলের পরব। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীর ব্রত ও পূজা এখানকার সমন্বয়ী সংস্কৃতির কথা মনে করায়। ধর্মঠাকুর রাঢ় অঞ্চলের এবং ডোম জাতির পূজিত দেবতা। পণ্ডিতদের মতে ধর্মঠাকুর শিব ঠাকুরের আধিপত্যে আপন মহিমা হারিয়ে ফেলেছেন। শিবের গাজনের অনুষ্ঠানের মধ্যে অনার্য্য জাতির প্রভাবের স্মৃতি দুর্লভ নয়। এ অঞ্চলে মহাদেবের মন্দির প্রায় সব গ্রামেই রয়েছে। প্রাত্যহিক পূজা অবশ্যই করণীয়। এর পাশাপাশি চৈত্র মাসের গাজন পরব ভক্তদের বিশেষ নিয়ম পালন ও কৃচ্ছসাধনের ভয়ঙ্কর সব পক্রিয়ায় নিম্নবর্ণের লোকেরা সানন্দে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গাজন উপলক্ষ্যে আচার ও অনুষ্ঠানে অনুসৃত কার্যগুলি এলাকার স্বাতন্ত্র্য সূচক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

সেকালে বয়স্কা অর্থাৎ ঠাকুরমা স্থানীয় মহিলারা কথা বলতেন ছড়া কেটে।[২] এই সব ছড়ায় পুত্রবতী নারীর আনন্দ, শিশুদের খেলার বিভিন্ন ভঙ্গী, তাদের লেখাপড়ার পদ্ধতি, সমাজের ধনী দরিদ্রের কথা, সাধু ব্যক্তির কথার সঙ্গে মিলছে কুচক্রী মাণুষের কথা, ধর্মীয় বিদ্বেষের কথা, জীবনের আশা-আকাঙ্খা, ঘাত-প্রতিঘাত আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের সম্পর্ক, দেবদেবীর কথা, কর্ম জীবনের কথা, সর্বোপরি সমাজ জীবনের সমস্ত রকমের জীবনাচরণের কথা ছড়ার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। ছড়াগুলির মধ্যে এই সব বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে মানুষের চিন্তা-ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। ছড়ার মতো এই অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে সৃষ্ট ধাঁধাগুলিও আমাদের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে। ধাঁধার মধ্যেও পারিবারিক জীবন, বুদ্ধিজীবন, কীটপতঙ্গ, পাখী, গৃহপালিত পশু, সংসারের কথা বর্ণিত। মানুষের পূজার্চনা, পরিবারের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, মেয়েদের প্রসাধনী দ্রব্য, প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য, যানবাহন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গাছপালা, খাদ্য-পানীয়, বুদ্ধিজীবি মানুষ, এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনের

পুরোধা পুরুষ মহাত্মা গান্ধীকে নিয়েও বিভিন্ন প্রকারের ধাঁধার বিষয়বস্তু করে এ অঞ্চলের মানুষ সামগ্রিক এক জীবন পরিচয় ধাঁধার মাধ্যমে উৎঘাটন করার চেষ্ঠা করেছেন।[৩] ছড়া ও বাঁধার ন্যায় লোকসংগীত, প্রবাদ ও পাঁচালি গানের মাধ্যমেও এই অঞ্চলের মানুষ সামগ্রিক সমাজ জীবনকে প্রকাশ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা অদ্যাবধি দেখিয়ে চলেছেন। প্রবাদে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে গোষ্ঠী জীবনের পরিচয় পর্যন্ত অপরূপভাবে বিবৃত করার চেষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তাই হল প্রবাদের লক্ষ্য। প্রবাদে স্থূল জীবনের রসবোধের সঙ্গে অদ্ভূত রসের আশ্চর্য সমন্বয়ের কথা জানা যায়।

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক বৃহৎ বঙ্গ বলতে সমগ্র বাংলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামেকে বোঝাতো। আমারা জানি ঋক বেদে 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ করা নেই, 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থেই আমরা প্রথম 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ পাই।[৪] সেখানে বঙ্গবাসীদের 'বয়াংসি' বা পক্ষীজাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পন্ডিতেরাই অনেকে মনে করেন এ সময়ে বঙ্গবাসীদের অনেকে পাখির মত দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলত বলে তাদের এই নাম। তবে, এটাও সত্য যে ঐ সময়ে এ দেশের অস্ট্রিক ভাষী লোকেরা নিজেদের খেরওয়াল বলে পরিচয় দিত। কেরওয়াল কথাটির অর্থ হল- খের কথাটির অর্থ পাখি বা পাখিদের বংশধর। প্রাচীন বঙ্গভূমির আদিবাসী-সংস্কৃতি বলতে 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বর্ণিত বয়াংসি জাতির কথাই ভাবতে হয়। তার আগে ঐ বঙ্গবাসিদের আর কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় নি অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পাওয়া যায় সমগ্র বাংলা দেশ জুড়ে এক সুসভ্য জাতির অস্তিত্ব। সম্ভবত এই সুসভ্য জাতির বিবর্তিত রূপ হলো আজকের বাঙালি জাতি।

বঙ্গ সংস্কৃতি এক মূল্যবান ঐতিহ্যপূর্ণসংস্কৃতি। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সমন্বয়ে ক্রমাগত গড়ে উঠেচে এই সংস্কৃতি। মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করেই সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ প্রাক- ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে তার আঙিনায় আকৃষ্ট করেছে। এই সমস্ত জনগোষ্ঠী নিশ্চয়ই তাদের আহার ও বাসস্থানের সন্ধানেই বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। বাংলায় সেসময়ে শিকার করে জীবিকা নির্বাহের জন্যে বন্যপশু পরিপূর্ণ অরণ্য ছিল। খাদ্য উৎপাদন অর্থাৎ কৃষিকাজ করার মত প্রচুর উর্বরা জমি ছিল। খাদ্য সংগ্রহ করার মতো অসংখ্য নদী নালা ছিল। মোট কথা, যে সমস্ত আদিম জাতি বাংলায় এসেছিল, সবাই বাংলার মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুকুল পরিবেশ পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের অনেকেই আজকের বাঙালী বলে পরিচিত সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আবার অনেকে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নেয়। তারাই আজকের পিছিয়ে পড়া তথাকথিত আদিবাসী সমাজ। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি কিভাবে পরিপুষ্ট হয়ে সমৃদ্ধি ঘটেছে, এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে তারই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অনার্য সংস্কৃতির ভিত্তিমূলের উপর আর্যসভ্যতার আধুনিক ইমারথ গড়ে উঠেছে।[৫] তাই স্বভাবতই অনার্য-সংস্কৃতির বহু উপকারণই এই ইমারতের গড়ন-গঠনে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। বাংলার পূজা-পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্ম-শিল্পকলা তার

প্রত্যক্ষ নিদর্শন তা না হলে বর্তমান বঙ্গ সংস্কৃতির মূলে অনার্য প্রভাব যে কতখানি পড়েছে - তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

এই অধ্যায়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় হলো সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আধুনিক বৃহৎ বঙ্গ-সংস্কৃতির মধ্যে জনজাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যতা বিচার। তাই সর্বাগ্রে দরকার আরণ্যক বঙ্গ-সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা।

যে কনো স্থনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে বহিরাগত সংস্কৃতি, যা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ হয় বা গেঁথে যায়। এর মধ্যে দূরবর্তী যোগসূত্র অনেককাংশে প্রতিভাত হয়। বাঙালী সংস্কৃতি বর্তমানে বাঙালীয়ানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অনেককাংশে বৃহত্তর বাংলার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে বাংলা দেশ সহ অসম, ওডিশা, ঝাড়খন্ড ও বিহারের মধ্যে বিস্তৃত রয়েছে। বাংলাদেশ এখন মুসলিম অধ্যুষিত। অন্যান্য রাজ্যের স্বভাব এই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কালচার বাঙালী কৃষ্টির সঙ্গে একটি যোগবন্ধন ঘটিয়েছে। লোকসংস্কৃতি আর শিষ্টসংস্কৃতি হাতে ধরাধরি করে অগ্রসর হয়।

বাঙলার বাউল গান উত্তরবঙ্গে যতখানি উজ্জীবিত, পৌষ সংক্রান্তিতে বীরভূমে জয়দেবের মেলা যেভাবে আকর্ষণীয় সেভাবে অন্যত্র হয় না। উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়া লোকসংগীতের আর এক রূপ। পৌষ সংক্রান্তির টুসুগান ও নাচ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় জীবন্ত রয়েছে, মূলতঃ আদিবাসী মহিলাদের আগ্রহে। পশুপতি প্রসাদ মাহাতো লিখেছেন- "লোকায়ত সংগীতে আছে ভালোবাসা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা।"[৬] সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলের লোকেদের কাছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই সর্বদা বিরাজমান।

বঙ্গ সংস্কৃতির মধ্যে লোক সংগীত সর্বত্রই বিদ্যমান। পল্লীগীতিকে নির্মলেন্দু চৌধুরী অনেক উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। বাউল সাধক পূর্ণদাস স্বনামধন্য। ঝুমুর গানের সঙ্গে আদিবাসী নৃত্যের রূপরেখা পরিস্ফুট হয়। ভাটিয়ালী গান ও লোক সংগীতের আর এক দিক। রীনা দত্ত ও করুনাময় গোস্বামী ভাটিয়ালী গানের উল্লেখযোগ্য নাম।অপরপক্ষে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি ও দেশাত্মবোধক গান বাঙালী সংগীতকে আরোও মহিমান্বিত করেছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকার চারণ কবিরা বেহালাকে গানে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু লঘু সংগীতের মাত্রা, ভাষা ও সুরের ভাবধারী কানকে পীড়া দেয়। অথচ যুবসমাজ এতে মশগুল হয় এবং বহুক্ষেত্রে উদ্দাম নৃত্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যুবসমাজের কাছে হিন্দী সংগীত অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ায় বাংলা সংগীত মার খাচ্ছে। অন্য ভাষায় সংগীত অবশ্য তখনি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

ওড়িয়া সংগীতের ধ্বনি সময়ে সময়ে বঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তরজা গান ধরে রেখেছে বাংলা ভাষায় বেতার কেন্দ্র। আদিবাসীদের কেদারা যন্ত্র থেকে বর্তমানে বেহালা এসেছে। জনসমাজে কবিগানের যথেষ্ঠ কদর ছিল। বঙ্গসাহিত্যের ন্যায় অন্য ভাষা সাহিত্যের তুলনায় চর্চার ততখানি অগ্রসর ঘটছে না। অর্থনৈতিক দুরবস্থা চাকুরীর অভাব, টি.ভি. ও মোবাইল কালচার এজন্য অনেকাংশে দায়ী। এতদ্ ব্যতীত শহুরে ভাবধারা সকলকে গ্রাস করার ফলে গ্রামের বৈচিত্র্য বহুলাংশে মার খাচ্ছে। এছাড়া প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পরিবর্তিত নারীর চোখকে হরিণের নয়নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু পরে পাখির নীড়ের(জীবনানন্দ)সঙ্গে তুলনা করা হয়। গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে সারি বিন্যাস,

যতির ব্যবহার যথার্থ হচ্ছে না। শিশু ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বহু কবিতা অনেক দুরে সরে যাচ্ছে। কিছু লেখার শ্লীলতা বর্জিত হচ্ছে। কিন্তু নাটক পরিবেশনে অনেক চাকচিক্য আছে।

মধ্যযুগ থেকে মুসলিমদের প্রভাব সারা ভারতসহ বঙ্গে প্রসারিত হয়েছে। হিন্দুদের ওলাইচন্ডী মুসলিমদের ওলাবিবি বলে একীভূত।[৭] নদীয়ার নগর উখড়া গ্রামোন্নয়ন সংস্থা ওলাইচন্ডী মেলার আয়োজন করে থাকে। আদিবাসীদের মাটির ঘোড়া, হাতি মূর্তি অনেক শোভা পায়। মুসলিমদের মূর্তি বিষয়ে বিরোধিতা যদিও বিরাজমান। তথাপি আস্তানা নিকটস্থ ঘোড়া মূর্তি বিরাজমান। বর্তমানে পাশ্চাত্যে সংস্কৃতি কিয়দংশে গ্রাহ্য হচ্ছে। ইংরাজী শিক্ষার ভাবধারা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ মানব বলে মনে করলেও বঙ্গে তাদেরকে ততখানি স্মরণ করা হয় না। বঙ্গ-সংস্কৃতিতে বারো মাসে তেরো পার্বণ পালিত হলেও আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। দোল উৎসব মজাদার হলেও পরদিন নোংরা জলের কাদার খেলা নিন্দনীয়। এখন গাজনের উৎসব খুবই কম দেখা যায়। অথচ আদিবাসী ও বর্ণহিন্দুদের কাছে এই উৎসব খুবই আকর্ষণীয় । মনসা পূজা কোথাও কোথাও ফ্যামিলি ভিত্তিক হয়।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে ধান জমিতে নল দেওয়া সহ চালভাজা সেবনের আয়োজন আর হয় না। আদিবাসী তথা জনজাতিদের করম গাছের ডাল জমিতে আর প্রদত্ত হয় না। গোয়াল পূজা না হওয়ার মতোই। ভারতের জাতীয় উৎসব তথা বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা আনন্দ সহকারে হচ্ছে। বারোয়ারিতে আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়। মাইকের গান শ্রুতিমধুর নয়। এর সঙ্গে সেবা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আনন্দদায়ক হলেও কিছু ক্ষেত্রে সংস্কৃতি বিপন্ন। বসন্তকলের বাসন্তী পূজা, কিছুস্থানে আনন্দ দেয়। দূর্গা পূজার পর আসে জগদাত্রী পূজা, সেখানেও বাঙালীরা মেতে থাকেন। তারপর কালীপুজো উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত আতসবাজী অধিক পীড়াদায়ক।

কার্তিক সংক্রান্তিতে নিঃসন্তান দম্পত্তির গৃহে কার্তিক মুর্তি প্রদান করে পুজোর ব্যবস্হা করানো হয়। লক্ষ্মীর আরাধনা বৃদ্ধি পেয়েছে কোজাগরীতে। মহরম ও মহরমের পরে ঈদ এখনো জাঁকযমকভাবে পালিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলায় হিন্দুদের আগমন ঘটে। আদিবাসিদের বাঁধনা পরব, বনদেবীর পুজো, ইতু পরব কিছু স্থানে পালিত হচ্ছে। প্রধান দেবতা মারাংবুরু, সিংবোঙ্গা পূজোয় আলাদা লোক বা ব্রাহ্মণের ব্যবহার হয় না।[৮] হুল উৎসব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাদানুবাদে পরিপূষ্ট। ঝাড়গ্রামের কাছে গুপ্তমণির মন্দিরে আদিবাসী ও জনজাতি লোকেরা বেশিরভাগ পূজা করেন। ভীম পূজা হয় মাঘমাসের শুক্লা তিথিতে। গনেশ পূজা এ বঙ্গে অনেক কম হয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা এখন দুর্গাপূজা করেন। কিন্তু সেই প্রবাসী হিন্দু সমাজের লোকেরা বঙ্গে বা ভারতে চলে আসলে ভবিষ্যতে সেখানে আর দুর্গাজার আয়োজন হবে কেনা, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়।

ইসলাম অবস্থানে চিত্রবিরোধিতার কারণে ২১শে ফেব্রয়ারী ভাষা দিবসের দিনে বাংলাদেশে আল্পনা অঙ্কন নিষিদ্ধ। কালী পূজা ঐতিহ্যপূণ্য। এ উপলক্ষ্যে আতসবাজীর সমারোহ বৃদ্ধি পেলেও দীপাবলীর আলোর রোশনায়ের মাত্রা কমতির পথে। বৈদ্যুতিক

আলোর ব্যাপক ব্যবহার সেই স্থান দখল করে নিয়েছে। বঙ্গে কিছু দক্ষিণ ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী অবস্হান করেছে। তারা প্রত্যহ সকালে আল্পনা দেয় এবং নববর্ষে মোমবাতি জালায়। মকর সংক্রান্তিতে টুসু পরব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আদিবাসী তথা জনজাতি শ্রেণীর লোকেরা টুসুগান পরিবেশন করেন। অগ্রহায়ন, পৌষের বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা এবং নিরামিষ খাওয়ার আয়োজন এখন সকল বাড়ীতে হয় না। বিজয়া দশমীতে কোথাও রাবন পোড়া উৎসব পালন করা হয়। এর মধ্যদিয়ে সম্প্রীতির মেলবন্ধন যেমন হয়, তেমনি সাম্প্রদায়িক হিংসা কমতে থাকে।

দোলের আগের দিন চাঁচর খেলা বহুস্থানে চলে। পীরের উরস কোথাও উদ্‌যাপিত হয়। নববর্ষে ভোরবেলা পাতা খড় পুড়িয়ে অগ্নিসংযোগের আয়োজনে নতুনকে স্বাগত জানানো এবং পুরাতন বৈষম্যকে পুড়িয়ে ফেলার প্রথা বালকেরাই বেশি মেনে চলে। ভীম পূজাতেও মেলা হয় মাঘের শুক্লা একাদশীতে। রামপুরহাটে শ্রী চৈতন্যের রথ হয়। অনেকের গৃহে শ্রাদ্ধের জন্য অশৌচ পালনের সময় কমেছে। এখন গ্রামীণ মেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আন্তরিকতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যথেষ্ট হচ্ছে। বহু গৃহে টেলিভিশানের প্রভাবে বহু সিনেমা হল এখন বন্ধ হয়েছে। এখন নববধূরা পুরো ভাদ্রমাসে পিত্রালয়ে সময় কাটান না, নাম মাত্র কয়েক দিন কাটিয়ে থাকেন। বাল্য বিবাহ হ্রাস পেয়েছে। হিন্দু পুরুষদের বহু বিবাহ বন্ধ হলেও মুসলিমদের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য বিরাজ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে সেকুলারিজম এর মার খাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে স্থান সংকুচিত হওয়ার এবং বহু ক্ষেত্রে দখল হওয়ায় আগেকার গৃহে মৃত ব্যক্তিকে নিজস্ব নিকটস্থ স্থানে দাহ করা হতো। আষাড়ে রথের সংখ্যা বর্ধিত হলেও বৈচিত্র্য আসেনি। পুরী, মাহেশ, মহিষাদল ও ইসকনের রথযাত্রা স্বনামধন্য।

মনসা মেলা ও গঙ্গা মেলা বারোয়ারির রূপ নিয়েছে। গঙ্গা নদীতে স্নান উপলক্ষ্যে মেলাও হয়। কার্ত্তিক, গঙ্গা, মনসা ও ভীম মূর্তির বিসর্জন হয় না। বিশ্বকর্মার আরাধনা কারখানা ও ব্যবসায়ী মহলে প্রচলিত। আনেকের বাড়িতে চাকর ও কর্মচারী থাকলেও দাসপ্রথা বন্ধ হয়েছে। তবে ভারতের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নোংরা নীতি চলছে। জঘন্য দেবসাসী প্রথা বন্ধ হয়েছে। মালাকারদের ফুলচাষ কমেছে, পশুশিকার কমেছে। বিশেষতঃ বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার জন্য অনেক গৃহে এখনো বংশগত শলাপরামর্শের সভা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে কিছু স্থানে মেলা বসে। বঙ্গে গঙ্গা সাগরের মেলা বিখ্যাত। নদীতে বা পুকুরে ভোরবেলা বহু মানুষ স্নান সেরে পূণ্য সঞ্চয়ের বাসনা এবং পরে নতুন জামাকাপড় পরিধান করে। শুধু বঙ্গে নয় সারাবিশ্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা রকম সংস্কার বিদ্যমান। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং শিক্ষার প্রসারে কুসংস্কার কিছু দূরীভূত হয়েছে। শহরে ধনীদের গৃহে কোন উৎসবে আদিবোসী তথা জনজাতি লোকের আগমন ঘটে। শিষ্ট সংস্কৃতির পরিসর প্রসারিত হলে ও কিছু ক্ষেত্রে নাচ গানের আসরে শ্লীলতা বজায় থাকে না। বিঞ্জাপনের সৌজন্য হারাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে বাংলা ও অসমিয়া ভাষার মধ্যে মিল হওয়ার কারণে বাংলা দেশে যেমন বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা কল্পে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, তেমনি অসমের বরাক উপত্যকাতেও ১৯৬১ এর ১৯শে মে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। লক্ষ্মী পূজার সময় বা অগ্রহায়ণ পৌষে বৃহস্পতিবার অনেকের গৃহে পিটুলিতে

আল্পনা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। বাচ্চাদের ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ বর্তমানে কমতির দিকে। বাঙালী সমাজে পুকুর প্রতিষ্ঠা করা বা বট-অশ্বথ পাশাপাশি লাগিয়ে প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান কালের খুবই বিরল ঘটনা। কোথাও কোথাও শিবালয়ে জল ঢালার দৃশ্য নয়নগোচর হয়। মাটির জিনিস ও কাঁসার বাসনের ব্যবহার ততখানি নেই। মহোৎসবে এখন সেবার নিমিত্ত পদ্মপাতা গরমিল। বসন্ত রোগ এখন কম হলেও লোকে আর মায়ের খেলা বলে না।[৯] মাঠে ধান কাটার সময় শিশুদের ধান কুড়ানোর মজা প্রত্যক্ষ হয়নি। তীর্থ যাত্রা সহ ভ্রমণ বাঙালী জীবনে যথেষ্ঠ পরিপুষ্ঠ। আশ্বিনের অষ্টমীতে স্বল্পস্থানে কুমারী পূজার আয়োজনের মাধ্যমে কুমারীত্বকে মর্যাদা জ্ঞাপন করা হয়। আদিবাসী ডান গুরুর প্রভাব, ডাইনি সন্দেহে হত্যাকরণ, বহুবার সমালোচিত। বিবাহ ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুদের কিছু সংস্কার আদিবাসীদের গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বাঙালীদের পোশাকে লুঙ্গির ব্যবহার এসেছে মুসলিমদের কাছথেকে এবং প্যান্ট পরিধানের ব্যবস্থা এসছে ইংরেজদের সান্নিধ্য থেকে। হিন্দু বাঙালীরা নিজেদের সংস্কৃতিকে সঠিক ভাবে মেনে চলতে কিংবা পালন করতে অপারগ হচ্ছে। জটিল পরিস্থিতিহেতু আদিবাসীদের অনেকে বঙ্গে এসে বাঙালী হয়েছেন। তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের হাঁড়িয়া ভক্ষণ ও মান মর্যাদা বাড়ানোর প্রক্রিয়া হ্রাস পেয়েছে। তবে এই রীতি এখন বিশেষ চালু নেই। শিশুর জন্মদিনে কেক কাটার প্রথা অবশ্য আমরা খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে লাভ করেছি। ব্যবসার জন্য তালপাতার বাঁশি নজরে পড়ে না। ঘরে তোয়ালে ও আসন বোনা যেন সেকেলের হয়ে গেছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গে বাঙালীদের কর্ম অপেক্ষা কথার ফুলঝুরি অধিক। এক জায়গায় কয়েকজন যুবক বসলে তো কথার মাত্রাও মাত্রাছাড়া। বয়স্কদের প্রতি পূর্বে যে শ্রদ্ধার ভাবধারা ছিল, এখন সেই ধারা যথেষ্ঠ ঋণাত্মকধর্মী। এর জন্যে অধিক লোকসংখ্যা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, প্রবল রাজনীতি বহুলাংশে দায়ী। তবে কিছু ক্ষেত্রে বয়স্কদের ত্রুটি দৃষ্টি গোচরে আসে। চাকুরীর সুবাদে এবং সরকারি বাদান্যতায় কিছু পরিবার স্বচ্ছল। আত্মীয়তার আত্মার নৈকট্য কমেছে। যত্রতত্র কুকথা বীজ বপন করছে। আবার আঞ্চলিক দিক থেকে ভাষার হেতু বাংলা ভাষার প্রয়োগে পার্থক্য ধরা পড়েছে। অন্যান্য ভাষা স্বল্প মাত্রায় বাসা বেঁধেছে। চালচলনে আভিজাত্য সরলতা শিষ্টাচার অহংকার বোধ মিলে মিশে এ কালচার হয়ে গেছে।[১০]

বাংলায় পটশিল্পের উল্লেখ রয়েছে, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসে, বানভট্টের হর্ষচরিতে, কালিদাসের শকুন্তলায়, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবে। মৃৎ শিল্প পুতুল তৈরীতে পরিস্পুট। এখনও সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চল বাঁশ ও বেতের তৈরী সামগ্রীতে ভরপুর হয়ে উঠে। মূলতঃ মাহালিদের এই ক্রিয়া মার খাচ্ছে। কারণ প্লাস্টিক ও পলিথিনের সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম দামে সংগ্রহ করা যায়। লোকসৃষ্টির নন্দনতত্ব, লোকশিল্পের জাতি তান্ত্রিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পে উন্নতির পথ প্রশস্ত হচ্ছে। পোড়া মাটির ঘোড়া ও হাতি মূর্তির ছলন শুরু হয় বাঁকুড়াতে। আদিবাসীদের দ্বারা ঝিনুকের খোল পুড়িয়ে চুন তৈরী কম হচ্ছে।

সংস্কৃতির ভাব প্রকাশে লোকসাহিত্যের কিঞ্চিৎ ভূমিকা বিদ্যমান। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কিছু গল্প সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে (ঠাকুমার ঝুলি, ঠাকুর দাদার ঝুলি প্রভৃতি)

প্রকাশ করে বহু গৃহে পৌঁছে দিয়েছেন। অন্যান্য প্রদেশেও লোকসাহিত্যের চর্চা রয়েছে প্রবাদ বাক্য মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বাংলার রবীন্দ্র নাথের প্রথম ছেলেভূলানো ছড়া সংকলিত হয়েছিল। এতে লোকসমাজের বিভিন্ন রূপ প্রতিফলিত। বিভিন্ন স্থানের উপকথা ও রূপকথার মিলন হল এই ছেলেভূলানো ছড়া।

প্রাচীন কালের কথা থেকে কৃষ্টি কথাটির আগমন । কৃষ্টির প্রকাশ ব্যাষ্টি ওসমষ্টি দুই প্রক্রিয়া। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় উপনিষদ থেকে, সংস্কৃতি শব্দটি চয়ন করেন এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলা লেখায় প্রকাশ ঘটালেন যা ইংরেজিতে কালচার কথাটির প্রকাশ। লোক পরম্পরায় আগত সাংস্কৃতিক ভাবধারা হল লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতি বঙ্গ-সংস্কৃতির আদিম রূপ বলে বিবেচিত। সুধীর চক্রবর্তী বঙ্গে ৩৮ টি উপজাতির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তপশিলী জাতি উপজাতি তথা দলিত সমাজ নিয়ে অনেক বেশি এ বিষয়ে সন্তোষ রানা তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন। সংস্কৃতির ৩টি রূপ হল - নগরসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিম সংস্কৃতি। প্রাচীন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দু একটি ক্ষেত্র বাদ দিলে সাংস্কৃতিক ভাবধারায় যথেষ্ঠ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নগর সংস্কৃতি হল আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতির পারিচায়ক।

হিন্দুদের মহোৎসব যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে। এতে রামায়ণ গান, কৃষ্ণকীর্ত্তন পরিবেশিত হয়। এই কীর্ত্তনের প্রসার ঘটেছে শ্রীচৈতন্যের সময় থেকে। শীতলা মঙ্গল, মনসা মঙ্গল, চন্ডী মঙ্গল কম পরিবেশিত হচ্ছে। মন্দির মসজিদ, চার্চ ও মঠের আকর্ষণ অনুভব করে ভক্তি বিহ্বল চিত্তে। কিন্তু মাটির হরিমন্দিরের উত্তরণ ঘটেছে পাকা মন্দিরে।

বাঙালীদের আরো কিছু পারিবারিক আনুষ্ঠানিক পর্ব উল্লেখ করা যাক। যেমন ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাখী বন্ধন, মনসা পূজা ইত্যাদি। পূর্ণিমাতে বারিপূজা, ঝুলন, ক্ষেতমাটি পূজা, ষষ্ঠী পূজা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। ভূমিকম্প হলে এখনোও শঙ্কধ্বনি করা হয়।[১১] পূর্নিমা, অমাবস্যা ও বৃহস্পতিবারে নিরামিষ ভক্ষণ এখন বেশীরভাগ সংসারে মানছে না। ক্ষৌরকর্মের ব্যাপারটাও তাই। গঙ্গায় মৃত ব্যাক্তির আস্থি বিসর্জন দেওয়া ও শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। হিন্দুদের তুলসী তলায় সন্ধ্যারতি হয়ে থাকে। সকালে বহু গৃহে শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থাকরা হয়। বিশেষ রোগের জন্য দু একটি শিব মন্দিরে এখনোও অইধ্যা পড়া চলছে। পৌড়ান অষ্টমীর অনুষ্ঠান এখন কমতির দিকে। মুসলিমদের নামাজের অনুষ্ঠান বিরাজমান। দিবসে একাদশীর উপবাস কম জন পালন করে।

যাত্রা শিল্পে ৮০ ও ৯০ এর দশকে যতখানি রমরমা ছিল, তা এখন পশ্চাৎপদ। গ্রামাঞ্চলে ক্লাব ভিত্তিক ও অনুষ্ঠান ভিত্তিক যাত্রা ও থিয়েটারের যে চাহিদা নিজেদের মধ্যে প্রতিভাত হোত বর্তমানে সেই পর্যায় দুর্লভ হয়েছে। সিনেমা কালচার টিভির পর্দায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলা চলচিত্রের রুপরেখা অনেকখানি পরিবর্তিত। হিন্দি চলচ্চিত্রের স্টাইল কিছুটা প্রতিফলিত। সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহ বাংলা চলচ্চিত্রকে অনেক উচ্চস্থানে নিয়ে গিয়েছেন। চলতচ্চিত্র উৎসবও পালিত হয়। অক্ষয়তৃতীয়ায় হাল খাতা হয়। অনেকে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেন। বিদেশি সংস্কৃতি থেকে আগত ১লা এপ্রিল-ফুল বানানোর প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছে। ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন আদিবাসীদের গো-পরব উড়িষ্যা থেকে আগত। এখন পাঁজি দেখে স্থানান্তর করলেও ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার কিছুটা মন্দা দেখা

দিয়েছে। অম্বুবাচীতে দুধ, আম সেবনের রীতি এখনো প্রতিটি বাঙালি গৃহে বিরাজিত। যেসব আদিবাসী খ্রীষ্ঠান হয়েছে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান একটু অন্যরকমের। বিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আতিথিদের অনুমতি নেওয়া হয়। আদিবাসীদের ঘরের বাইরে দেওয়ালের নিম্নভাগে রংদেওয়ার রেওয়াজ অনেকের মধ্যেই রয়েছে। মনসা পূজার সময় সাপুড়িয়াদের সাপের খেলা চলে। গ্রামাঞ্চলে গোবর দিয়ে হাতের সাহয্যে মেঝে নিকানোর ব্যবস্থা রয়েছে। আদিবাসীদের মুরগী বলি দিয়ে বনদেবীর পূজাকল্পে ঝুমরি খেলা বঙ্গে এখন আর হয় না। পারিবারিক অনুষ্ঠান বড় শহরের তুলনায় পল্লী বাংলায় অধিক প্রচলিত। নিম্নবর্ণের মানুষজনেদের কাছে ডাইনি বিদ্যা খুবই সমস্যার সৃষ্টি করে।

বাঙালী সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকের মনে আশঙ্কা পরিবর্তন সব দেশে সর্বত্র বিদ্যমান। বাঙালী একটু বেশী অনুকরণ প্রিয়। সার্ব্বজনীন পূজোতে প্যান্ডেলের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে এবং সমকালীন কিছু থিম এসে পক্ষ বিস্তার করছে। হিন্দুদের কিছু অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজন প্রচীনকালের রীতি অনুযায়ী। কিন্তু রাজ্য সরকারের স্মারকে ধৃষ্টতাকে সঙ্গে গেঁথে শিক্ষাক্ষেত্রে কাঁচি চালানোর চেষ্টা হয়েছে। টোলগুলির বেশিরভাগ বন্ধ। কেদারনাথ লাহিড়ী তাঁর 'ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি' ভাষা পুস্তিকাতে বলেছেন, কৃষ্ঠিধারা বঙ্গে এসে বাংলা ভাষার উপর বিশৃঙ্খলাচরন করছে। বর্তমান সময় পর্যন্তও তার ধারা অব্যাহত। তবে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা চলছে কিছু ক্ষেত্রে অফিসে বাংলা ভাষার মাধ্যমে কর্মসম্পাদনের নিমিত্তে। কিন্তু মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম - এই ভাবনা সকলের মনে গ্রথিত নয়। বঙ্গে সাঁওতালিভাষা দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকার স্বীকৃতি লাভ করলেও তার ব্যবহার উপযুক্ত নয়।[১২] ম্যাক্সমূলার ভারতবর্ষকে দার্শনিকদের দেশ বলে আখ্যা দিয়েছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সেই ভাবধারা উজ্জীবিত থাকা প্রয়োজন।

ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী ব্রত মেয়েদের সঙ্গে এখন অল্প সংখ্যক পুরুষও পালন করছেন। এদিন বালির বিশ্বনাথ মন্দির সহ বঙ্গে তারকেশ্বর ও বক্রেশ্বরে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য শিব মন্দিরে সাধারণভবে জল প্রদানের ব্যবস্তা করা হয়। শনিদেবের আরাধণা বিভিন্ন স্থানে মূর্তির সামনে হয়ে থাকে। কার্তিক পূর্ণিমায় কার্তিক পূনম অনুষ্ঠান শোভাযাত্রা সহকারে হয়ে থাকে। কোলকাতায় বুদ্ধপূর্ণিমা অনেক ঘটা করে পালন করা হয়। একসময় বঙ্গে অনেক বৌদ্ধ বিহার বা বৌদ্ধ ছিল।

নানান ক্লাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি পর্যায়ে নানান ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। এগুলির মাধ্যমে সংগীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি অঙ্কন প্রভৃতি আয়োজন করা হয়ে থাকে। অবশ্য দুরদর্শনে, সিনেমাতে নৃত্যের কিছুক্ষেত্রে এসবের অয়োজন বা পরিবেশনা যা শিষ্ট সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে না। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতির মাধ্যমে যে নৃত্যের অবতারণা তা কিন্তু সমীহ আদায় করে। আধুনিক সংগীতও লোকগীতিতে হালকা ভাবের নৃত্য পরিবেশিত হয়। এ বিষয়ে সংস্কৃতিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ভাবধারা প্রয়োজন। আদিবাসী সমাজের নাচে আন্তরিকতা ও সরলতা ভরপুর।

আদিবাসীদের বড়ম ও সিনিদেবীর পুজো উল্লেখযোগ্য জরাসুর ও রঙ্কিনী পূজারও প্রচলন ছিল। প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন- 'লোককথা সংস্কৃতিরই উপলক্ষ্য।' পাল ও সেন রাজাদের আমল থেকে বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তিমুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১৩] বাসুদেব সাহা

তাঁর 'বাংলায় লোকসংস্কৃতি ও জীবনানন্দ' গ্রন্থে বলেছেন, 'ঐতিহ্য ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেনা।' প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ থেকে লোকসংস্কৃতির প্রভাব প্রতিভাত।[১৪] আধুনিক যুগে শিষ্ট সংস্কৃতির ভাবধারা প্রবাহিত। বঙ্গেযাত্রাগান কাব্যিক ভাবধারায় শুরু হয়ে ছিল। ৯০০ বছর পূর্বে জয়দেবের গীতগোবিন্দ দিয়ে পালাগান রচিত হয়েছিল। উক্ত সময়ে প্রধান বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা। আগেকার দিনের নারীর অভিনয় পুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করার মতো। ভারতের নাট্য সংস্কৃতি গ্রন্থে তাপস কুমার দে লিখেছেন, - 'বঙ্গসংস্কৃতি অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল যাত্রাগান।' মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ ধর্মবিশ্বাস উৎসব-পার্বণের সঙ্গে বঙ্গ-সংস্কৃতি অনেকাংশে ওতোপ্রোতোভাবে যুক্ত।[১৫] বাঙালী ও বাঙালীর বিবর্তন গ্রন্থে ড. অতুল সুর জানিয়েছেন 'অস্ট্রিক যুগ থেকে বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেয়েছিল নানারূপ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া'।[১৬] ভারতের ন্যায় বঙ্গে মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কান্তি প্রসন্ন সেন গুপ্ত তার 'দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ভারতসহ বঙ্গে বিদেশীরআগমনের ফলে মিশ্র সংস্কৃতির ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধদের প্রভাব যথেষ্ঠ ছিল, এখন কমতির দিকে।'[১৭] রূপ কথা ও উপকথার গল্পে কিছু ট্যাবু (Tabu) বা বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্যের সময় থেকে বৈষ্ণব ধর্মের আচার আচরণ বঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। রূপকথাও উপকথার গল্পে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্যের সময় থেকে বৈষ্ণব ধর্মের আচার, আচরণ বঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য গ্রন্থে ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লোক উৎসব, লোকসাহিত্য, রূপকথা, উপকথা, লোক সংগীত, ধাঁধা, মৌখিক ছাড়া সংগ্রহাকারে গ্রথিত করেছেন। বর্গী হাঙ্গামা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বৈষম্যের ফলে সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ কিভাবে বঙ্গের মানুষের ক্ষতি করে ছিল এবং সেসময় সংস্কৃতি বিপন্ন হয়েছিল সেকথা জানিয়েছেন ড. অনিমা মুকোপাধ্যায় তাঁর 'আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ' পুস্তকে। সেই সঙ্গে কিছু পুরানো ছড়ারও উল্লেখ করেছেন।[১৮] এইরূপ প্রতিক্রিয়া পরিস্ফূট W.B. Hunter এর 'গ্রামবাংলার ইতিকাথা' গ্রন্থে ১৮৬৬ সনের দুর্ভিক্ষ এবং ১৭৭০ সনের গণমড়ক বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এতে সংস্কৃতি তো বিপন্ন হবেই। পূর্বে রাজাও বাদশাহদের তাম্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাহিত্যের কিছু রূপ ধরাপড়ে। সবগুলি অবশ্য উদ্ধার কর সম্ভব হয়নি। শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ পুস্তকে দীনেশ চন্দ্র সরকার কিছু উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশের অবহেলার দৌলতে মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও নায়েক বিদ্রোহ বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে আরো তীক্ষ্ন করেছে। পূর্ব মেদিনীপুরের কৈবর্ত্য বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতির সব কিছু উদ্ধৃত হওয়া সম্ভব নয়- গোষ্ঠী পরম্পরা এমন কিছু বিবরণ মানুষ বিস্মৃত হয়েছে, সেগুলি আজ আর লিপিবদ্ধ নেই। আরো কিছু সামগ্রী নষ্ট হওয়ায় অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। রাম বংশকে কেন্দ্র করে ইতিহাস যে সময় থেকে লিখিত হয়েছে। সেই সময় থেকে সংস্কৃতিক বিষয়ক লেখা কিন্তু জনসমক্ষে পৌঁছে যায়নি। বঙ্গ সহ সমগ্র ভারতে বিদেশীদের প্রভাবে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠল ও দলীয় সংস্কৃতি বারবার বিপন্ন হয়েছে। বঙ্গে আমরা যতই কলকাতামুখী হইনা কেন অনান্য জেলাগুলির কালচার রাজাকে সমৃদ্ধ করেছে। ড. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার ইতিহাস' গ্রন্হে লিখেছেন-'মেদিনীপুর

সমগ্র বাংলায় একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি কেন্দ্র।’[১৯] এই রাজ্যে বাঙালীদের সঙ্গে ওড়িয়া, হিন্দুস্হানী, পাঞ্জাবী, তামিল, মারাঠী, তেলেগু, মাড়োয়ারী প্রভৃতি গোষ্ঠী বসবাস করায় সাংস্কৃতিক ভাবধারার আদান প্রদান ঘটেছে। দাজিলিং শহরে গোর্খাদের সংস্কৃতি মিশ্রিত হয়েছে। সাপুড়েদের জমায়েত লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে লোকসংস্কৃতি চর্চা উল্লেখযোগ্য। বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ১৯৭৪ এর পর লোকসংস্কৃতির চর্চা উপর পাঠক্রম শুরু হয়। এই চর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের অবদান রয়েছে। Indian antiquary (কলকাতা) পত্রিকা কিছু লেখা উপহার দিয়েছে। লোকসংস্কৃতি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষন গ্রন্থে ড. সুস্মিতা পোদ্দার লিখেছেন, ‘লোক সংস্কৃতি হলো জাতি-আত্মার মূলের সংস্কৃতি।’[২০] লোকসাহিত্য চর্চার বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকখানি ম্লান। বাংলাদেশের থেকে আগত হিন্দু বাঙালীদের জীবন চর্চা, ভাষার প্রয়োগ ও খাদ্যগ্রহণ, কিছুটা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ভিন্ন ধরায় প্রবাহিত। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত, মুড়ি, মাছ, ডাল, সব্জি। তবে হিন্দুস্থান ও ইংরেজদের প্রভাবে রুটিও প্রধান খাদ্যের তালিকায় প্রবেশ করেছে। ১৯৫০ - তে আমেরিকায় লোকসংস্কৃতি বিয়রক আলোচনায় বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন জসীমুদ্দিন। কুষ্ঠিয়ায় তৈরী হয়েছে ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকাতে বাংলা একাডেমি, কুষ্ঠিয়াতে লালন একাডমি, রাজশাহীতে লোকসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিকিম কাশ্মীর সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং নেপাল ও তিব্বতে আদিবাসী সংস্কৃতি আজ বিপন্ন (কলকাতার বেতার - ১১/০৮/২০১৫) ইংরেজদের ভাবধারায় নামকে আসল না ভেবে পদবীকে আসল ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই গতি এখনো কিছুটা অনুসৃত হচ্ছে। আতিথেয়তায় চা পান এর মুখ্য ভূমিকা আমরা গ্রহণ করেছে ইংরেজদের নিকট। বৈশাখ জৈষ্ঠ্যে অতি গরম ও জলাভাবের দরুণ ভাঁন্ড দ্বারা বটবৃক্ষ, অশ্বথ ও তুলসী তলায় হিন্দুদের জলদান প্রক্রিয়া এক পূণ্য কর্মের প্রতিফলন। মহামায়া ও মকর সংক্রান্তিতে জলাশয়ে পূর্বপুরুষদের জন্য তর্পণ এর মধ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পরিস্ফুটিত। পুরাণগুলি মূলত গুপ্ত আমলে লিখিত। এগুলিকে অনুসরণ করে এবং মানুষকে গ্রহণ করে কিছু পৌত্তলিকতা, পূজা - পার্বণ, সাংসারিক ভাবধারা ও আচার অনুষ্ঠান অনুসৃত হয়। ধর্মী ভাবধারায় পুস্তক সম্পর্কে আলোচনা ও পঠন কিছুটা হ্রাস পারাপ্ত। তবে মঠ বা পাঠক্রম এই ভবধারা জীইয়ে রেখেছে। চৈতন্য আশ্রমে অপর দু -একটি আশ্রমে আলোচনা জাগ্রত, এখন তিথি ধরে বীজ বপন সবক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না। পুস্তকগুলি কথা মানুষেরই রচিত। এগুলিতে মহৎউদ্যোগের কথা যেমন রীতি, তেমনই অযৌক্তিক কিছু নিয়ম লিপি বদ্ধ। সে জন্য বিশ্লেষন করে কোনটি গ্রহণ যোগ্য, কোনটি গ্রহণ যোগ্য তা ভেবে দেখেন না বহু মানুষ। খাদ্য গ্রহণে কিছু শহুরে পরিবর্তিত রীতি মানুষ গ্রহণ করেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্য - সংস্কৃতি অনেকখানি যুক্ত, নল কুরিয়ে, মাহালি, লোহার মুন্ডা ও সাঁওতালদের বিবাহ বৃক্ষ নিমগাছ সর্পপূজার সঙ্গে জড়িত। শাল গাছের তলায় বাংলার বাগদি আর বাউরীদের বিবাহ হয়। দ্রাবিড় ও মুসলমানদের প্রিয় ফল তেঁতুল। বাংলাদেশেও এরা তাদের প্রিয় তেঁতুল তলায় বিবাহ ও সন্তানের জন্ম হলে পূণ্য বলে মনে করে।

তুলসীতো হিন্দুদের নানা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। কলাবউ বা নব পত্রিকা গনেশের পত্নী হিসাবে পূজা পদ্ধতির পুস্তকে বর্ণিত। কদম্ব বৃক্ষকে অনেকে করম বলে। এর তলে ভাদ্রের শুক্লপক্ষে নৃত্য উৎসব হয় কিছু স্থানে। বাংলায় লোকনৃত্যের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের 'লোক ঐতিহ্য' গ্রন্থে সুশীল কুমার ভট্টাচার্য করম পূজা সম্পর্কে লিখেছেন - "শস্য সংগ্রহের পর (এটি) মুন্সী সম্পদশালী উৎসবের নৃত্য।"[২১] সারাদিন উপাসের পর বৃক্ষের একটি শাখাকে প্রাঙ্গনের মধ্যে পুঁতে তাতে সিঁদুর, চন্দন দিয়ে পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাকে মাদোল, ঢোলোক বাজিয়ে পুরুষরা হাত ধরাধরি করে ফিরে আসেন উল্টো দিক থেকে, তেমনি মেয়েরা ও আসেন অর্ধবৃত্তাকারে গান গাইতে গাইতে অপরূপ ফুলসাজে সেজে। প্রথমে দক্ষিণ থেকে ও পরে উত্তর দিকে, চার মাত্রায় পা ফেলে ঠিক তেমনি আবার বসে হেলে, নারী ও পুরুষ দুটি অর্ধাবৃত্তাকারে শেষে পূর্ণবৃত্ত সৃষ্ট করে। সম্পূর্ণ বৃত্তটি ঘুরে নাচতে থাকে সম্মেলক গান গাইতে গাইতে। এই লোককাহিনী থেকে হাঁসদা, মান্ডি, সরেন, মুর্ম্মু, কিস্কু প্রভৃতি পদবীগুলি এসেছে। সেই কাহিনীতে পৃথিবী সৃষ্টি এবং হংস হংসী থেকে মারাংবুরুর (অনেকের মতে শিব ও মারাংবুরু অভিন্ন) আশীর্বাদে সন্তানদের আবির্ভাবে বিদ্যমান। হান্টারের লেখা থেকে পাই- সোহরাই (নভেম্বরে), সাঁকরাত (তীরন্দাজী ক্রীড়া কৌশল), বাহা (মার্চে), পোতা (চড়ক), এরোসিম, দাঁশায় প্রভৃতি হল সাঁওতাল দের পরব। এগুলিতে হাঁড়িয়া সেবনের রেওয়াজ আছে।[২২] কলাগাছ আদিবাসীদেরও প্রিয়।

ড. প্রবোধ কুমার ভৌমিক তাঁর 'Lodha of West Bengal' গ্রন্থে লোধাদের Crime of Police Custody এর মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুন্দর জীবনে আনায়নের লক্ষ্যে নারায়ণগড়ের বিদিশাতে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন।[২৩] সেখানে নৃতত্ত্ব বিষয়ে সেমিনার হয়। All India Seminer on the problem of socio Education Stratification in India (1976)। National Seminer on tribe, Development (1993) প্রভৃতি প্রকাশিত হয় এগুলিকে অন্যান্য গোষ্ঠী অপেক্ষা Caste ও Tribe দের বিভিন্ন সমস্যা ও রীতি বিষয়ক বিভিন্ন জনের আলেচনা সান্নিবেশিত হয়েছে বিশেষ একটি গোষ্ঠী বিহার থেকে কলকাতায় এসে কারখানায় কাজ নিয়েছেন। বর্ণহিন্দুদের চুঁতমার্গ এখন অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত। আন্দামান ও নিকোবরের যে সব আদিবাসী রয়েছে তাদের জীবন ধারা কিছুটা পুরানো দিনের অনুগামী। তবে সরকারি পরিকল্পনা থেকে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আন্দামানে জারোয়ারা অনেকটাই এখনো কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে এবং অনেকে উলঙ্গ থাকে। শবর গোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে ভলোবাসে। এদের সাপ ধরা, চাটাই , ঝাঁটা বোনা ও পশুশিকার নিজেস্ব জীবিকা ও আচরণের পর্যায়ে পড়ে। সরকারি পর্যায়ে tribe দের উন্নতির জন্য সংস্থা গঠিত হয়েছে। লোধাদের বড়াম বা গড়াম দেবী শীতলা দেবীর ন্যায় পূজিতা। শীতলা সম্পর্কে মন্তব্য - Who is considers to be the controlling directly epdemic desieares like chetera and pre[২৪] (some as pects of indian Anthropology R.K. Bhowmick দ্রঃ) গৃহস্থ প্রধান আদিবাসীদের মধ্যে গুনীণদের প্রভাব যথেষ্ঠ। মেদিনীপুরের লোধাগুলি অঞ্চলে কিছু গুনীণ বিদ্যমান। এখন আদিবাসীদের কিছু অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ব্রাহ্মণদের আহ্বানে করা হয়। কিছু ব্রাহ্মণ এইঅঞ্চলে সাড়া দেন। ভারতসহ বঙ্গের প্রচীন সংস্কৃতি আজ বিপন্ন এরকমই বিশ্লেষণ রয়েছে, রাজনৈতিক

ষড়যন্ত্রের কবলে ভারতীয় সংস্কৃতি পুস্তিকাতে। গোষ্ঠীগত দিক থেকে কর্মের বিভাজনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে। হাড়িদের / বেহারাদের পালকি পহন কমেছে। দুলেদের দুলি বহন দেখা যায় না। মুচিদের জুতোর কাজ এখনো চলছে। মেথরদের পায়খানা পরিস্কারের ব্যাপারটা অনেকখানি হ্রাস প্রাপ্ত। তবে স্যনিটারি চেম্বার গুলি সময়ে পরিস্কার করতে হয়। ঝাড়ুদারদের কাজ আফিসে ও স্টেশনের লক্ষ্যে কাজ করা। ডোমরা বাঁশ ও বেতের কাজ এখন আর কম করে থাকেন। নাপিতদের নিজস্ব কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। জেলেরা এখনো মাছধরে। কামার কুমোরের কাজ অব্যাহত। তবে ওই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি থেকে এখনো কিছু সংখ্যক শিক্ষিত হয়ে আফিসে বা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কর্মে নিযুক্ত হচ্ছেন। হিন্দুদের শবদেহ দাহ করা হলেও মঠ / আশ্রমে বৈষ্ণবদের শবদেহ সমাধিস্থকরা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব, স্বামীজী ও কিছু গুনীজনদের প্রভাবে গোষ্ঠীগত বিহেদ কিছুটা আস্তগামী।

এতো গেল আধুনিক বৃহৎ বঙ্গে-সংস্কৃতির নানান পর্যায়। তবে বঙ্গ-সংস্কৃতির কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনজাতি সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। তার বৈশিষ্ঠ্যের সামগ্রিকরূপ একে একে নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। মঙ্গল ঘটের কথাই ধরা যাক। শুভ কাজে বাঙালী হিন্দু সমাজে জলপূর্ণ কলস দরজার পাশে রাখা হয়। এই পবিত্র কলস রাখার রীতি যতদূর সম্ভব আদিবাসী অস্ট্রিক সমাজ থেকেই নেওয়া হয়েছে। সাঁওতাল সমাজে এই মঙ্গল ঘটকে ‘সাগুন ঠিলি।’ আদিবাসী অস্ট্রিক সমাজে এই জলপূর্ণ কলসের তাৎপর্য গভীর। জল পূর্ণ ঘঠ দেখে যে কোনো কাজের শুভাশুভ বিচার করা হয়। কোথাও যাত্রাকালে কিংবা কনে দেখতে গিয়ে যাত্রা পথে যদি জলপূর্ণ কলস দৃষ্টিপথে পড়ে, তবে তা খুবই মঙ্গলজনক বলে তারা মনে করে। এখনও তারা কোনো জায়গায় নতুন বাড়ী করার পূর্বে সেখানে জলপূর্ণ কলস স্থাপন করে তবে জায়গার ভালমন্দ বিচার করে। যদি কোনো কারনে ঘটের জল শুকিয়ে যায় কিংবা কমে যায়, তবে সেই জায়গা ভালোনয় বলে তারা ধরে নেয়। সে জায়গায় বসবাস করলে সংসারের শুভ হবে না কিংবা বংশবৃদ্ধি ঘটবেনা বলে তারা সেস্থান পরিত্যাগ করে। আবার গ্রামের পাঁচজন যখন বিচারে বসেন তখন তারা একটি জল সামনে নিয়ে বসেন। তাঁদের বিশ্বাস জলপূর্ণ ঘট থাকলে পাঁচজনের বিচার সভায় গন্ডোগোল, অশান্তি প্রভৃতি হবে না। আজ ঐ সংস্কারই বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং সকল শুভ অনুষ্ঠানে মঙ্গল ঘট রাখা হয়।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কলা ও কলাগাছের ভূমিকাও উল্লেখযেগ্য। হিন্দু বাঙ্গালির এমন কোনো অনুষ্ঠান নেই যেখানে কলাগাছ কিংবা কলার ব্যবহার নেই। কলার নৈবেদ্য ছাড়া দেবপূজা হয় না। কলার ঘোলের ডোঙ্গায় পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিন্ডাদি অর্পণ করা হয়। কাঁঠালি কলা ছাড়া লক্ষ্মীপূজা হয় না। বিয়ের সময়ে ছাদনাতলা ঘেরার জন্য কলাগাছ লাগে আবার কলা গাছ দিয়েই তৈরী হয় কলাবউ, শুধু তাই নয়, গনেশপত্নী রূপেও কলাবতীর পূজো হয়। গৃহপ্রবেশ, আতিথিবরণ ও মঙ্গলানুষ্ঠানে কলাগাছ না হলে তো চলে না। অথচ কলা দেখে যাত্রা মানেই অশুভ যাত্রা। ‘কাঁচাকলা’ দেখানো মানেই অসম্মান করা। এই কলা কিংবা কলাগাছ সম্পর্কে আদিবাসী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ? এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় কলাগাছ উর্বরতা ও ফলনশীলতার প্রতীক।[২৫] কলাগাছ যে একবারই মাত্র ফল দেয় ও তারপর মরে যায়। সেজন্য বন্ধ্যা পুরুষ কিংবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই কলাগাছ রোপণ

করে। বিবাহের ক্ষেত্রেও কলাগাছের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো অবিবাহিত যুবক, কোন স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা বিধবা নারীকে সোজাসুজি বিবাহ করতে পরে না। এজন্য অবিবাহিত যুবকটিকে প্রথমে আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি কলা গাছকে বিবাহ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কলাগাছকে প্রতীক কল্পনা করে পূর্ববর্তী সকল অশুভ সম্পর্ককে তার মধ্যে আরোপিত করা হয়। কলা গাছ যেহেতু একবার দিয়ে অল্পদিনের মধ্যে মারা যায় তাই কলাবউ এর কোন অশুভ প্রভাব এই যুবকটির উপর আর পড়তে পারে না। বরং কলাবউ সমস্ত অশুভকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করবে। এই প্রতীক বিবাহ অনুষ্ঠানটির পর যুবকটি, স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা বিধবা নারীকে সাঁগা অর্থাৎ পত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

অবার সুবর্ণরেখা পার্শ্বস্থ জনজাতি সমাজ কলাগাছকে জীবন্ত আত্মার অধিকারী রূপে বিশ্বাস করে । কারণ কলাগাছে কখনও বজ্রপাত হয় না। অর্থাৎ প্রকৃতির বজ্রমুষ্ঠি কলাগাছের উপর কখনো পড়ে না। বস্তুত কলাগাছ যেন প্রকৃতির অশুভ ফলশ্রুতির প্রতিষেধক রূপে কাজ করে। এ ধারণাটাই আদিম সমাজ থেকে হিন্দু সমাজ গ্রহণ করেছে।

এরপর দুর্বাঘাস, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে দুর্বাঘাসের একটি বিশেষ স্থান অছে। দুর্বাঘাস ছাড়া পূজা-অর্চনা বা কোনো শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা নয়। হিন্দু সমাজে দুর্বাঘাসের জন্ম নিয়ে একটা পৌরাণিক কাহানিও শোনা যায়। সমুদ্র মন্থনের সময় মান্দার পর্বতের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে বিষ্ণুর দেহের লোমগুলি দুর্বাঘাস হয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। সমুদ্রমন্থন করে দেরতারা ও অসুররা যে অমৃত সংগ্রহ করেন তার কয়েক ফোঁটা আবার এই দুর্বাঘাসের উপর পড়ে যায়, ফলে দুর্বাঘাস অমর ও পবিত্র। সাঁওতালদের বিশ্বাস, আদিতে মাটি জলে ভরা ছিল, সে মাটিতে চাষ-আবাদ কিংবা বসবাস করে আসছিল। কথাটি কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ বাস্তব।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস, দুর্বা ঘাসের জন্যই মাটি শক্ত হয়ে পৃথিবীকে মনুষ্য বাসের উপযোগী করেছে। তাই তাদের কাছে দুর্বাঘাস অতি প্রিয় এবং পবিত্র। দুর্বাঘাস শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অক্ষয় ও অমররূপে বিরাজ করে বলেই দুর্বাঘাস, হাতে নিয়ে যাকে আর্শীবাদ করা হয়, তারও বাড়বাড়ন্ত সে রকম হবে এবং দীর্ঘজীবী হবে। এজন্যই দেখাযায়, বাড়ীতে নতুন বৌ এলে ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়, যেন তার সন্তান সন্ততিরা দুর্বাঘাসের মতো বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত বাড়ী-ঘর পূর্ণ করে দেয়।

দুর্বাঘাস আবার সবরকম অশুভ শক্তির প্রতিষেধক। এজন্য আদিবাসী ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় দুর্বাঘাস, আতপ চাল প্রভৃতি আমপাতায় জড়িয়ে সুতো দিয়ে তার ডান হাতে বেঁধেদেওয়া হয়। বিয়ের পর সেই বাঁধন খুলে দুর্বাঘাস দেখে ছেলে মেয়ের মঙ্গল বিচার করা হয়।

দুর্বাঘাসকে কেন্দ্র করেই 'দুর্বাষ্টমী' নামে ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত পালন করা হয়। এ সময় ব্রতিনীরা দুর্বার কাছে প্রার্থনা জানায় যে, দুর্বা যেমন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অক্ষয় ও অমররূপে বিরাজ করেছে, সে রকম তদের সন্তান সন্ততিরাও যেন বিরাজ করে, দীর্ঘজীবী হয়। এই ব্রত উদযাপনের পর দুর্বাঘাসকে নানা উপাচারে পূজা করতে হয়। এইভাবে দুর্বাঘাস বাংলার জনজীবনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ধান-দর্বা দিয়ে বর-কনেকে যে আশীর্বাদ করা হয় তর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবার ধান হিন্দুদের সমস্ত মাঙ্গলিক কাজে লাগে। ঘট স্থাপন কালে ধানের প্রয়োজন হয়। পূজোতে তো লাগেই। গৃহস্থ বাড়ীতে নতুন গরু কিনে আনা হলে হলুদ গোলা জল ছিটিয়ে গরুর পা ধুয়ে দেওয়া হয় এবং ধূপ-ধুনা প্রদীপ জে্বলে ধান দিয়ে গরুকে প্রনাম জানানো হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস, ধনদাত্রী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ধানের গভীর সম্পর্ক। লক্ষ্মীদেবী ধানের শীষ প্রতীকে পূজা পান। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকতে শুরু করলে গৃহস্থবাড়ীতে মাঠের পাকা ধানের এক মুঠো শীষ কেটে এনে সযত্নে একটি নতুন কপড়ের টুকরোতে বেঁধে ঘরের এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। সমস্ত অগ্রাহায়ণ মাসের বৃস্পতিবারের ধান শীষগুলিকে লক্ষ্মীর প্রতীক কল্পনাকরে পূজা করা হয়। পরে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিনে ঐ শীষগুলিকে বিশেষভাবে পূজা করা হয়।

আদিবাসী সমাজে কামনা-বাসমা পূরণের জন্য বিভিন্ন রকম শস্য ব্যবহৃত হয়। বিবাহের পর বর-কনের কল্যাল কামনা করে তাদের লক্ষ্য করে ধান ছড়ানোর রীতি আছে। আবার কনেবাড়িতে বর-কনে বিদায়ের পূর্বে-ঘরের মধ্যে দুজনের যুক্ত অঞ্জলীতে ধান ভরে দেওয়া হয় এবং ঐ ধান কনের মা আঁচল পেতে গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই শুভকর্ম হল বংশধারাকে কল্পনা করে সন্তান কামনার প্রতীক। ধানের প্রচুর ফলনশীলতার জন্য উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও সন্তান সন্ততিলাভের কামনায় এ অনুষ্ঠান করা হয়।

সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ কিংবা অষ্টপ্রহর প্রভৃতি পূজা-উৎসবে আমপাতা দড়িতে গেঁথে গ্রামের রাস্তায়, ঘরের চালে, মন্ডপের চারপাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আম্রপল্লবের এই মাঙ্গলিকতা বিশেষভাবে লক্ষনীয়।

ঝাড়খন্ডের আদিবাসী সমাজের কাছে আম গাছ অতি পবিত্র। এমনিতেই তারা সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতি উপাসক।[২৬] সুপ্রাচীনকাল থেকে গাছ গাছড়া ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থেকেই হোক বা অন্য কোন ভবেই হোক, তারা গাছপালাকে জীবন্ত আত্মার অধিকারী বলে মনে করে এসেছে। বস্তত, উদ্ভিদের যে প্রাণ অছে তা বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক সত্য। আদিবাসীরা সেই অতীতে এ সত্য অনুধাবন করেছিলেন। গাছপালার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করে সশ্রদ্ধচিত্তে তাদের দেবত্ব অর্পণ করেছেন। তাই তারা গাছে উঠবার আগে গাছকে প্রনাম করে গাছে ওঠে, যেন বৃক্ষদেবতার রোষে কোনো বিপদ না ঘটে। আমগাছ মঙ্গলের প্রতীক এবং অশুভ প্রতিরোধক। ঝাড়খন্ড অঞ্চলে বহু আদিবাসী গোষ্ঠী বিবাহ যাত্রার পর্বে 'আম বিহা' অনুষ্ঠন পালন করে। বর একটি ফলন্ত আম গাছকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে। এর পর বরের মা-মাসী-পিসীরা বরকে কোলে বসিয়ে কচিকচি আমপাতা বা আমপাতার বোঁটা চিবোতে দেয় এবং বরের মুখ থেকে চিবানো পাতা বা বোঁটা মা-মাসীরা হাত পেতে নিয়ে মুখে দেন আর বরের গালে চুম্বন করেন। এটাকে 'আমলো' খাওয়া বলা হয়। ঝাড়খন্ডের বিবাহ অনুষ্ঠানে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী আচার এবং মা-মাসীদের কাছে এটা যেন একটা নবজন্মের অনুষ্ঠান। বর এখানে মাতৃক্রোড়ে শিশু ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেন সকল অশুভ আমগাছের উপর আরোপিত হয়। এছাড়া আমগাছ পরিপূর্ণ ফলন্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী অক্ষয়,

তাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্তানের দীর্ঘজীবন ও বহু পাত্র কন্যার জনক হওয়ার প্রর্থনা জানানো হয়।

সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা পূজা উৎসবে আম-পাতার ব্যবহার শুভ মনে করা হয় তা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু আমপাতাই সব নয়, দেখা যায় বিয়ে ও পৈতায় আম কাঠের পিঁড়ি দরকার। হিন্দু শবদেহ দাহনেও আম কাঠ প্রয়োজন। মোট কথা-জন্মও মৃত্যুর সব অনুষ্ঠানে আমগাছের স্থান আছে। গ্রামের মানুষের কাছে আমগাছ বড় পবিত্র এবং এজন্যই তারা মনে করে আমগাছে ভূত-প্রেতনি অপদেবতা অশুভ শক্তি আশ্রয় নিতে পারে না।

আদিসাসী সমাজে আবার বিয়ের সময়ে ঘটির জলে আমপাতার জল ডুবিয়ে সেই জল পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করার সময়ে ছিটিয়ে দেয়। এটাও একটা মাঙ্গলিক আচার। ঘট বা ঘটি সর্বত্র গর্ভের প্রতীক, এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন। ‘আমবিহা’ অনুষ্ঠানের সময়ে আমগাছকে বাঁদিকে রেখে কিংবা ‘সিঁদুরদান’ অনুষ্ঠানের সময় বরকনে পরপরস্পকে বাঁদিকে রেখে প্রদক্ষিণ করে থাকে। সূর্যচক্রের আবর্তনের অনুকরনেই এই প্রদক্ষিণ। আদিবাসী সমাজে এটা টুকটাক যাদুবিশেষ। প্রজননক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। উইলিয়াম ক্রুকের কথায়-“This-movement in the course of the sun acts as a magical fertility charm” মোট কথা - আমগাছ ও আমপাতা মঙ্গল, দীর্ঘজীবন এবং উর্বরতাবাদের বিশেষ দৃষ্টান্ত।

‘আমবিহা’ অনুষ্ঠানের সময় বর সাতবার আমগাছকে প্রদক্ষিণ করে কিংবা সিঁদুর দান অনুষ্ঠানের সময়ে বর-কনে পরস্পারকে বাঁয়ে রেখে প্রদক্ষিণ করে। হিন্দু সমাজে সাত পাকে বাঁধা বা সপ্তপদী গমন অনুষ্ঠান আছে। প্রশ্ন এবার - সাতবার বা সপ্তপদী কেন? প্রশ্নটি সামান্য হলেও ভাববাবের মত। সাধারনতঃ ‘সাত’ সংখ্যাটি আমাদের কাছে পয়া এবং পবিত্রতা সূচক সংখ্যা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ‘সপ্ত’ উপসর্গপাচক অসংখ্য প্রাচীন শব্দ আমরা পাই, যেমন সপ্তদ্বীপ, সপ্তলোক, সপ্তপাতাল, সপ্তসমুদ্র, সপ্তজিহ্বা, সপ্তছন্দ, সপ্তস্বর, সপ্তর্ষি, সপ্তনদী ইত্যাদি।

বেদ, পুরাণ উপনিষদ প্রভৃতিতে এই ‘সপ্ত’ উপসর্গবাচক শব্দের বিশেষ প্রবাহ লক্ষিত হয়। হিন্দু বিবাহের বর-বধূর একত্রে ‘সপ্তপদীগমন’ অনুষ্ঠানে এধরণের প্রভাব কতখানি পড়েছে বলা সত্য, তবে অনুষ্ঠানে দেখা যায় হোমের উত্তর দিকে আলপনা অঙ্কিত সাতটি মন্ডল থাকে। মন্ডলগুলির উপর আলতা মাখানো সাতটি পান কেটে রাখা হয়। মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বধূ বরের সঙ্গে এই সাতটি মন্ডল অতিক্রম করে।

বাংলাদেশের প্রায় সব সমাজেই বিয়ের আগে বর কনেকে হলুদ মাখানো হয়। গায়ে হলুদ বা ‘গাত্রহরিদ্রা’ বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। বিয়ের বাড়ীতে খুব ঘটা করে এই গায়ে হলুদের দাগ কাটা হয়, পাড়া পড়শি সবাইকে বর-কনের গায়ে-হলুদের সময় ডাকা হয়। অনেক সমাজে আবার বরের গায়ে হলুদ না হলে কনের গায়ে-হলুদ হয় না। কিংবা বরের গায়ে-হলুদের অবশিষ্টাংশ কনের গায়ে-হলুদে লাগে। কোথাও কোথাও দেখা যায় বরের ছোঁয়া হলুদই একমাত্র কনের গায়ে হলুদের জন্য কোটা হয়।

হলুদ উর্বরা শক্তির রঙ, মঙ্গলের রঙ, এ রঙের কু-নজর প্রতিহত করার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে বলে সুবর্ণরেখা সান্নিহিত জনজাতি সমাজ বিশ্বাস করে। তাই হলুদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলতে হয় কৃষিজীবী মানুষের দীর্ঘদিনের আভিজ্ঞতা এর মধ্যে কাজ করছে। হলুদের বীজাণুনাশক শক্তি আছে বলে গ্রামীণ সমাজে হলুদ নানা দিক থেকে অর্থপূর্ণ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হলুদ ব্যবহৃত হয়। জনজাতিদেরও বিশ্বাস, হলুদে যাদু শক্তি নিহিত আছে।

সুবর্ণরেখা নদীর সন্নিহিত মানুষের জীবন সংস্কৃতিতে আমরা হলুদের ব্যপক ব্যবহার দেখতে পাই এবং বিবাহের লোকাচার হিসাবে গায়ে-হলুদ যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও তারা এর ব্যবহারিক গুণাগুণ অস্বীকার করে না। এ হলুদ কোটার পর ‘নায়কে’ তা তিনটি শাল পাতার বাটিতে করে ‘মারাংবুরু’, ‘জাহেরএ্যরা’ এবং ‘মঁড়েকো’ নামে নিবেদন করেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য সমাজের মানুষের মন সবসময় দ্রব্যগুণ বিচার করে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। তাই আদিম ভাবনাচিন্তায় হলুদের মধ্যে যাদুশক্তির ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের কাছে হলুদ উর্বরাসক্তির প্রতীক। হলুদের মধ্যে প্রচুর উৎপাদিকা শক্তি আছে। এটা ভালোভাবে বোঝা যায় সুবর্ণরেখা নিকটস্থ সমাজের ‘জাওয়া’ উৎসবের আচার-অনুষ্ঠানের উপকরণ থেকে। ‘জাওয়া’ সীমান্ত বাংলার শস্যোৎসব- শষ্যের সমৃদ্ধি কামনায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুড়মি - মাহাতো ভূমিজ - খাড়িয়া-কামার-কুমোর-বাগাল ইত্যাদি গোষ্ঠীর মানুষ ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে এ উৎসব পালন করে। তবে উৎসবের আচার অনুষ্ঠানের উপকরণ থেকে বোঝা যায়, এটা শুরু শস্য কামনারই উৎসব নয় সন্তান কামনাও বটে। আদিম সমাজের বিশ্বাস, কুমারী মেয়েদের মধ্যেই উর্বরা শক্তির মাত্র অধিক তাই মেয়েরা অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগে ‘জাওয়া’ ডালি’ তে নানা রকম শস্য বীজ ছড়িয়ে তার উপর হলুদ গোলা জল ছছিটিয়ে দেয়। আর প্রতি সনধ্যায়অঙ্কুরিত চারা গুলিকে বন্দনাকরে । হলুদ গোলা জল ছাড়া চারা বৃদ্ধি হয় না, তাই গানে শোনা যায়-

“ জাওয়া যে দিলে তরহা হলুদ কোথায় পলে গ,
তাদের জাওয়া লহকে বাড়হে।”[২৭]

গানের মধ্যে হলুদের উর্বারশক্তির গুণ বর্ণিত হয়েছে। আবার আদিবাসী সমাজে অশুভ শক্তির প্রভাব রোধ করার জন্যও হলুদ ব্যবহৃত হয়, বিবাহের সময়ে বর কনেকে হলুদ-তেল মাখানো হয় কুনজর এড়ানোর জন্য। শুভ কাজে ভূত-প্রেত, ডাকিনি-যোগিনী কিংবা অপদেবতাদের কু-দৃষ্টি পড়তে পারে এ আশঙ্কায় গায়ে হলুদের সঙ্গে সঙ্গে বরের হাতে লোহার জাঁতি ও কনের হাতে কাজল পাতি তুলে দেওয়া হয় রক্ষা কবজ হিসাবে। লোহার অশুভ শক্তি প্রতিহত করার ক্ষমতা অধিক। তাই গ্রাম্য-সমাজে শিশু জন্মাবার পর তার হাতে লোহার বালা পরানো হয়। হাতে লোহার বালা থাকলে অশুভ শক্তি কোন ক্ষতি করতে পারে না। ভূত-প্রেত-অপদেবতার ভয় কাটাবার জন্য ছেলে - মেয়েদের কোমরে লোহার জাল-কাঠিপরিয়ে দেওয়া হয়। ধান ঝাড়াই করার সময় অপদেপতার কুদৃষ্টি লেগে ধানের পরিমান যাতে কমে না হয় সেজন্য খামারে কাস্তে - কুড়ুল কিংবা লোহার কোন অস্ত্র রাখা হয়। হলুদ

সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে আবার বলতে হয় যে হলুদ উর্বর শক্তির রঙ, মঙ্গলের রঙ। এ রঙে কুনজরে প্রতিহত করার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে বলে জনজাতি সমাজ বিশ্বাস করে। তাই আদিবাসী বিয়ে বাড়িতে নতুন কাপড়ে অশুভ দৃষ্টি যাতে না পড়ে সে জন্য নতুন কাপড়ের খুঁটে এক কোনে সামান্য হলুদ লাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু পল্লী সমাজেই নয় শহরে বাঙালী সংস্কৃতিবান পরিবারের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের কোণেও হলুদলাগিয়ে দেওয়া হয়।

বিবাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য লোকাচার হল বর কনের স্নানের জন্য 'জলসহা'-র জল ব্যবহার। এয়োরা এই জল সংগ্রহ করে আনে এবং বরের বাড়তে বরকে ও কনের বাড়িতে কনেকে স্নান করায়। ভোর হতে না হতেই এয়রা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে কাছাকাছি কোনো পুকুরে জল আনতে যায়। সঙ্গে নেয় একটি খাঁড়া কিংবা কোন লোহার অস্ত্র । কলসিতে জল ভরার আগে জলের উপর লোহাস্ত্র দিয়ে ঢেরা চিহ্ন কাটা হয় এবং সেসময় কলসিতে জল নেয়। সেই জল নিয়ে সবাই গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে আসে। ওই জলে বরের বাড়ীতে বরকে ও কনের বাড়িতে কনেকে স্নান করানো হয়।

বিবাহে কিংবা অন্য কোন অনুষ্ঠানে জলের ব্যবহার অতি সাধারণ ব্যাপার মনেহলেও জনজাতি সমাজে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। সাঁওতালী কিংবদন্তি অনুসারে আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, সর্বত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ভূতল সৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সেটাইতো সর্বজন স্বীকৃত। কাজেই দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল সমাজ চিরকালই বিজ্ঞানের আদর্শে আস্থাবান। এজন্যই আদিবাসী সমাজ জলকে আতি পবিত্র বলে মনে করেন। জলে থুতু ফেলেন না, জলে প্রস্রাব ও মল ত্যাগ করেন না, অন্তঃসত্ত্বা নারী ভরা নদী পেরোলে কিংবা নদীপেরোবার সময় বাচ্চাকে স্তন্য পান করালে জল দেবতার কোপ দৃষ্টিপড়ে। জলদেবতাকে তুষ্ট রাখার জন্যেই এই সমস্ত রীতি- রেওয়জ ও বিধি নিষেধ। আপাত দৃষ্টিতে জল আমাদের প্রত্যেকের কাছে অতি পবিত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন অশুচি বা অশুদ্ধ বস্তুতে জল ছিটিয়ে শুদ্ধ হতে দেখা যায়। হিন্দু সমাজে অবশ্য জল মাত্রই গঙ্গা জল, গঙ্গা জলে পবিত্রতা সমগ্র হিন্দু সমাজে স্বীকৃত। ক্রুক সহেব বলেছেন - "in India as else where water is the prime source of fertility" তাই দেখা যায় বিয়ের দিন এয়ো-স্ত্রী এবং সন্তান বতী মহিলারা পুকুর থেকে কলসী ভরে জল নিয়ে আসে এবং বর-কনেকে সেই জলে স্নান করানো হয়। বলাবাহুল্য বর-কনের স্নানের অনুষ্ঠানটি অশুভ শক্তি নাশ ও প্রজনন ক্ষমতে বৃদ্ধির একটি যাদু অনুষ্ঠানেই টোটেম রূপে গণ্য হয়।

সামাজিক অনুষ্ঠানে কিংবা পূজা উৎসবে আম পাতার ব্যবহার অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। দেখা যায় বিয়ে ও পৈত্যের আম কাঠের পিঁড়ি দরকার। হিন্দু সৎকারে ও আম কাঠ প্রয়োজন। জন্ম ও মৃত্যুর সব অনুষ্ঠানে আম গাছের স্থান আছে। গ্রামের মানুষের কাছে আম গাছ বড় পবিত্র এবং এজন্যই তারা মনে করে আম গাছে ভূত-প্রেতনি অপদেবতা, অশুভশক্তি প্রভৃতি আশ্রয় নিতে পারে না।

পশুপাখি, বৃক্ষলতা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি জনজাতি সমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভকরেছে। সুবর্ণরেখা নিকটস্থ বিভিন্ন জাতি সমাজগুলির সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করে আদিম যুগের ধর্মবিশ্বস কে নবরূপে দৃঢ় রূপে স্থাপন করেছে। বাঙালী হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত এই ধরনের ভাবনা চিন্তা আদিবাসী সমাজ থেকেই মুখ্যত এসেছে।

গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির উপর দেবত্ব আরোপ করার প্রবনতা সুসভ্য বাঙালী আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই পেয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় বিভিন্ন গাছ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রতীক। যেমন নারায়ণের প্রতীক তুলসী গাছ, শীবের বেল গাছ, কৃষ্ণের কদম্ব গাছ, মনসার সিজ গাছ, শীতলার নিম, লক্ষ্মীর কলাগাছ ইত্যাদি। মেয়েরা বিভিন্ন ব্রত পালনের সময়ে এ সমস্ত গাছই পূজা করে থাকে। বট, অশ্বথ, তুলসী গাছের মূলে বারিবর্ষণ ধর্ম কর্মের অঙ্গীভূত। সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্য কামনায় এ সমস্ত গাছের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এমনকি শারদীয়া দূর্গাপূজায় যে 'নবপত্রিকা' স্থাপন করা হয় তা এই গাছপূজারই নামান্তর মাত্র। নবপত্রিকর স্থাপনে .যে সব গাছ বা গাছের ডাল বা পাতা লাগে সেগুলিহল- কদলী, ডালিম, ধান, হলুদ, মান,কচু বেল, অশোক ,ও জয়ন্তী। এই সব গাছ, গাছের ডাল বা পাতা দিয়ে তৈরী নবপত্রিকা মন্ত্রপূত হলে তারা আর গাছ থাকে না। তারা এক একটি দেবী হয়ে যান। কদলী হল ব্রাক্ষণী, কদু হল কালিকা, ডালিম হল রক্তদন্তিকা, অশোক হল শোক রোহিতা, জয়ন্তী হল কার্তিকী, বেল শিব, হলুদ হল দূর্গা, মান হন চামুন্ডা, ধান হন লক্ষ্মী। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, আদিম সমাজে গাছ গাছড়ার পূজা করা মানেই অসুরেরর অন্তরালে দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করে মঙ্গল কামনা এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া। রোগ ব্যধির কারণ সম্পর্কে আদিম সমাজে বিশ্বাসে যুক্তি নিষ্টাও আছে এবং সেগুলো যোগ্যও বটে।

আমার জানি গ্রাম্য-সমাজে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যধির জন্য বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত। ওঝারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাদু মন্ত্র, তেল মন্ত্র, জল পড়া প্রভৃতির সাহায্য যেমন নেন, তেমনি গাছ গাছড়ার রস ও লতা পাতার ঔষধি ফুলের ব্যবহারও তাদের কাছে অপরিহার্য। এ সঙ্গে দেখা যায় নিয়ম-কানুনে জড়িত লোকবিশ্বাস। এই লোকবিশ্বাসের অন্তরালে রয়েছে ম্যাজিক এবং এই লোকবিশ্বাস এনে রোগের মধ্যে প্রয়োগ করে অশুভ লক্ষণ দূর করা হয় । সাধারণ মানুষ এই গাছ গাছড়ার রস ও তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োগ করার চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে অবাক হয়। বস্তুত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এই গাছ-গাছড়ার গুণ উপেক্ষা করতে পারেনি। আদিবাসী সমাজে ও সেই সঙ্গে গ্রাম-সমাজ সুপ্রাচীন কাল থেকে তাদের বিশ্বাস ও প্রচীন রীতি আঁকড়ে ধরে আছে। চিকিৎসা ব্যাপারে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, গাছ-গাছড়ার মধ্যে দ্রব্যগুণ রয়েছে এবং এই দ্রব্য গুণের ব্যাপারটা এসছে 'অ্যানিমিজম' বা প্রাণবাদ বিশ্বাসের ধারানা থেকে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে। সেই প্রাণ-বিশ্বাস ম্যাজিকের মাধ্যমে রুপান্তরিত করে অসুস্থ লোকের মধ্যে প্রয়োগ করতে পারলে ফললাভ হবে এবং রোগ নিরাময় হবে। এখানেই আদিম বিশ্বাসের সার্থকতা।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন রূপায়ণ এই কবিরাজি ঔষধ ও ঔষধির উপর চিরকালীন নির্ভরশীল। যাই হোক - আদিবাসী সমাজ আদিমতম কাল থেকে গাছ-গাছড়া লতা-পাতায় প্রাণের এবং আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে এসেছে।

পশু-পাখিদের ক্ষেত্রেও একই চিন্তা-ভাবনা লক্ষ্য হয়। আদিবাসী সমাজ গৃহপালিত পশুপাখিদের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা অনুভব করে থাকে। অনেক পশুপাখি তাদের প্রয়োজনের গুরুত্বের জন্য কিংবা আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক (Totem) হওয়ার দরুণ পূজা পেয়ে থাকে। পশুপাখির প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা পূজানুষ্ঠানের ব্যাপারটা গভীর ভবে

বিচার করলে হয়তো নানা কারণ পাওয়া যেতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজের মানুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রের টোটেমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করায় অজানতে পশুপাখি পূজার উদ্ভব হয়েছে। পরবর্তীকলে কোনো কোনো পশু পাখি আবার হিন্দু সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন হিসাবে স্থান পেয়েছে। বাহন হলেও তারা সমান পূজ্য। প্রকৃত পক্ষে তাদের প্রয়োজন হয়েছে আদিবাসী সমাজেরই প্রতীক থেকে।

আল্পনা গ্রাম বাংলার সুপ্রাচীন কলা-শিল্প এবং গ্রামজীবনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পূজা, ব্রত, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে কুমারী এবং সধবা মেয়েরা আতপচালের পিটুলী দিয়ে ঘরের মেঝেতে কিংবা আঙিনায় নানাধরণের আলপনা দিয়ে থাকে। আজ ভাবতেই পারা যায় না যে, এই অতি পরিচিত গার্হস্থ্য শিল্পের ভিত্তি মূলে একটি অনাদিকালীন বিশ্বস্ত সংস্কারে নিহিত। এই মণ্ডন শিল্পের মধ্যে গৃহস্থঘরের মেয়েরা যে শিল্পানুভূতি ও কুশলতার পরিচয় দেয়, তা অতুলনীয়। বলতে বাধা নেই, এই সুপ্রাচীন মণ্ডন শিল্পটি গ্রামের সাধারণ মানুষের কলাজীবন, তাদের আচার, ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক ইতিহাসের অনুধারক।

অনেকেই মনে করেন আলপনা কথাটি সংস্কৃত ‘আলিম্পন’ থেকে এসেছে। ‘আলিম্পন’ কথাটির অর্থ প্রলেপ দেয়া। কিন্তু পণ্ডিতদের মতে এটা একটা তৈরী করা সংস্কৃত শব্দ। যার মূল নিহিত অনার্য ভাষায়। **১৯৫১**সালের আদমসুমারী পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠী রিপোর্টে এর মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, আলপনা শব্দটি সম্ভবতঃ আইল্পনা (আইল বা বাঁধ বাঁধবার কলা) থেকে এসেছে।

যাই হোক-আলপনা শব্দটি আধুনিক সংস্কৃতে রূপান্তরিত হলেও এটা যে একটা প্রচীন অনার্য শব্দ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া প্রাচীন কোনো কলাগ্রন্থেও আলিম্পন বা আলপনা কথাটির উল্লেখ নেই। আল্পনা কথাটির মত শিল্পটি যে কত প্রাচীন তা বলা কঠিন। বহু পণ্ডিতের ধারণা, আলপনা সংশ্লিষ্ট ব্রত ও পূজার নানা আনুসঙ্গ প্রাক-আর্য যুগে উদ্ভব। ভারতীয় কলা সম্বন্ধে সুপণ্ডিত আন্দকুমার স্বামী মনে করেন যে, বাংলা দেশে যেসব লোক-কলা বেঁচে আছে সেগুলি অন্তত পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন শিল্প কলা থেকে বয়ে এসেছে। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশের লোক - কলা ও সংস্কৃতির নবায়নের পুরোধা গুরুসদয় দত্তের ও সেইমত। তিনি বলেন যে, গোল আলপনা চিত্রের মধ্যিখানে বাংলা দেশের পল্লীরমণীরা যে পদ্মফুলের নকশা আঁকেন, তা মহেঞ্জোদাড়োতে ব্যবহৃত পদ্ম নকশারী অনুগামী ধারা। এই পদ্মটিকে মনে করা হয় বাঞ্ছাপূরণের উৎস আর ভারতবর্ষে সুপ্রচীন কাল থেকেই পদ্মফুল সূর্যের প্রতীক রূপে একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়ে এসেছে। পদ্মের চারপাশে দেখা যায় শঙ্খলতা যা শুভ্রতা ও পবিত্রতার প্রতীক। আল্পনায় আরো থাকে নান বিচিত্র নকশা যেমন - হাতী, ঘোড়া, পালকী, ফুল , লতা-পাতা, লক্ষ্মী ঝাঁপি, ধানের শীষ, ঢেঁকি, কুলো, কাস্তে, গায়ের অলঙ্কার ইত্যাদি। আপাত দৃষ্টিতে অসঙ্গতী মনে হলেও এই নকশাগুলিতে একটা পরস্পরগত গভীর দ্যোতনা অতি সহজেই উপলবদ্ধি করা যায়।

পন্ডিতদের একটা বড় অংশ মনে করেন, আচার্যদের আসবাব বহু পূর্বে এ দেশে যে সব অস্ট্রিক জাতি বাস করত তাদের শিল্পকলা থেকেই থেকেই আল্পনা এসেছে। তাঁদের মতে

বাংলা দেশের ধর্মাচার সম্পর্কিত এই লোক-কলা প্রথমে কৃষিজীবন সম্পকিত ছিল। যারা সে সময় এ দেশে বাস করত তারা যথেষ্ঠ শস্য পাওয়ার জন্যও ভূত-প্রেত তাড়াবার জন্য উপদেবতা ও যাদু ক্রিয়ার বিশ্বাস করত। এ সত্য হলে আল্পনা বা আইলপানা ক্ষেতের আল থেকে গৃহীত হওয়ায় মতবাদটি খুব অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তাছাড়া চালের গুঁড়ো শুকনো পাতা থেকে তৈরী রঙের গুঁড়ো কয়লা, পোড়া মাটি প্রভৃতি যেসব উপাদান আল্পনায় ব্যবহৃত হয়, তা অস্ট্রিক সম্পর্ক যুক্ত। এমন কি চিত্রের উদ্দেশ্যে ও নক্শা অস্ট্রিকদের দান বলে মনে হয়। আর এটা সবাই স্বীকার করবেন যে, আমাদের দেশের বহু সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত ধারনা ও আচার অস্ট্রিক সমাজের অবদান।

আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রতি বৃহস্পতিবারে, উৎসবের দিনে, সংক্রান্তির দিনে আলপনা দেওয়া হয়। বিশেষ করে খামারে ধান উঠলে ও রীতির ব্যাতিক্রম হয় না। যতদিন খামারে ধান থাকে ততদিন গৃহস্থবধূ-বৃহস্পতিবারে আলপনা দিতে ভোলে না। ঘরদোর গোবর দিয়ে নিকিয়ে সদর দরজা থেকে শুরু করে সব কটি দরজা চৌকাঠে এবং খামারে মা লক্ষীর পায়ের ছাপ আল্পনা দেয়। পায়ের চিহ্ন সবসময় থাকে গৃহাভিমুখী। যতদিন না ধান ঝাড়াই শেষ হচ্ছে ততদিন সযত্নে এ রীতি মানা হয়। গ্রামের সমস্ত গৃহস্থ বধূরই উপস্য দেবী মা-লক্ষ্মী। গৃহস্থ বধূ মা লক্ষ্মীর পা আঁকতে গিয়ে বলে -

"আঁকিলাম পদ দুটি
তাই মাগো নিই লুটি,
দিবারাত পা দুটি ধরি
বন্দনা করি,
আঁকিমাগো আল্পনা
এই পুজো এই বন্দনা,
ক্ষমো দোষ
দাত্ত সান্ত্বনা।"[২৮]

বিন্দুকে কেন্দ্র করেই এই আল্পনা আঁকা শুরু হয়। কিছু থেকেই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি এই আল্পনার। বৃত্তটি বিন্দুরই বৃহৎ রূপ। তাই গ্রাম্য আলপনার চিত্রে জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। গ্রাম্য বধূ সরল বিশ্বাসে মনে করে যে, এই সুন্দর আলপনা যাদু-ছবি দ্বারা গ্রাম বা নগর নিরাপদ ও সমৃদ্ধিশালী হবে এবং চাষের জমি উর্বর ও ফলবর্তী হবে।

আর্য সভ্যতা ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণের ফলেই আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব। অনার্য রমণীদের সংস্পর্শে এসে আর্যরা আস্তে আস্তে অনার্য সমাজের লৌকিক দেব-দেবী, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি গ্রহণ করে। আল্পনাশিল্প কলাটির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। কারণ সমাজে জীবনের নানা সম্পদ, শ্যস্যক্ষেত্রে বাসস্থান, জনপদ সবকিছুকে নানা কুপ্রভাব থেকে বক্ষা করার জন্যই আল্পনার ব্যবহার। তবে অস্ট্রিক সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী পূজার অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে চিত্রিত করেই দেব-দেবীকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয়। সাদা রঙই পূজার অনুষ্ঠান

ক্ষেত্রে চিত্রিত করার মূল রঙ। আতপ চাল গুঁড়ো করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে তা তৈরী করতে হয়। কোনো কোনো সময় তার মধ্যে নানা জিনিসের শুকনো গুঁড়োও ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়। মোট কথা অলপনা- চিত্রিত ক্ষেত্রই ধর্মানুষ্ঠানের দেবী।

আদিবাসী পল্লীতে কিন্তু কু-নজর প্রতিরোধের জন্যই মূলত আল্পনা দেওয়া হয়। সাদা রঙ শুভশক্তির প্রতীক। বাঁধনা উৎসবের সময় সারা আঙিনা জুড়ে আল্পনা দেওয়া হয় । মেয়েরা দরজার চৌকাঠে দরজার বাইরে দু-পাশের দেওয়ালে পিটুলিগোলা দিয়ে হাতের ছাপ আঁকে। এমনকি লাঙ্গলের গায়ে, কৃষি যন্ত্রপাতির উপর, গরু মহিষের গায়েও পিটুলীগোলা দিয়ে হাতের ছাপ দেওয়া। কারণ হাতের ছাপ রক্ষাকবজেরই মূর্ত প্রতীক। গ্রাম সমাজে আবার অশুভশক্তি ও কু নজর প্রতিরোধ বর্গ ও আয়তক্ষেত্রের চিত্রও জড়িত। বিবাহ মন্ডপ বা ছাদনাতলায় এ ধরনের যাদু গণ্ডীর ভিতর অশুভ শক্তি প্রবেশ করতে পারে না- এ লোকবিশ্বাস অনেকেরই আছে।

এবার সিঁন্দুরের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বাঙালী-নারীর জীবনে সিঁন্দুরের গুরুত্ব যথেষ্ট। সিঁথিতে সিঁন্দুরের রেখা ও কপালে সিঁন্দুরের টিপ নারী সৌভাগ্যের বা সধবা অবস্থার বড় প্রমাণ। বাঙালী নারী যতদিন সধবা থাকেন, ততদিন পরম শ্রদ্ধাভরে এই সিঁন্দুর চিহ্ন ব্যবহার করেন। এটা তাঁর সন্মানের পরিচয়। অনেকে বলে থাকেন বাঙালীর এই সিঁন্দুর অনার্য-সভ্যতার দান এবং আর্য-অনার্য-সংস্কৃতির সম্বনয়ের ফল। কথাটা অতি সত্য। বাঙালী হিন্দু সমেজে সিঁন্দুরের প্রচলন আদিম সমাজ থেকেই গৃহিত। শঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' গ্রন্থে লিখেছেন- "ভবিষ্য-পুরানের ব্রহ্মপর্বে, অন্যান্য প্রচীন পুরাণে যে ঘট স্থাপনের ব্যবস্থা আছে সেখানে সিঁন্দুর দানের ব্যবস্তা নেই। বাংলার ভট্টভবদেব এবং পশুপতি পন্ডিত প্রভৃতি সিঁন্দুর দানের অনুকূল বৈদিক স্মার্ত অথবা পৌরাণিক কোনো শাস্ত্র খুঁজে পান নি। সুতরাং পাল যুগে ভট্টভবদেব এবং পশুপতি ভদ্র হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে 'শিষ্ট সমাচারাৎ' মারফৎ সিঁন্দুর দানের স্বীকৃতি দেন।"

অন্যদিকে, এ দেশের সমস্ত আদিবাসী সমাজে সিঁন্দুঁর সুপ্রাচীন কাল থেকেই জনপ্রীয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস, আদি পিতা মাতা পিলচু হাড়ম ও বুড়ী ছেলেমেয়ের বিবাহে রাস্তার লাল ধুলো ব্যবহার করেছিল। আদিম মানুষ এককালে নিজেদের চিহ্নিত করার জন্য লাল রঙ ব্যবহার করত এবং লাল রঙ তাদের কাছে ছিল বড় প্রিয়। লাল রঙ বা সিঁন্দুররের যে অতি মাত্রায় জীবনসার (Life essence) রয়েছে তা আদিবাসী সমাজে ভলোভাবে উপলবধি করা যায়।

যতদূর মনেহয়, পূজা কিংবা কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গোময় ব্যবহারের রীতি আদিবাসী 'হো' সমাজ থেকে বাঙালী হিন্দু সমাজে চলে এসেছে। সাঁওতাল, মুন্ডাদের মতো 'হো'-রাও অস্ট্রীক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ডালটনের মতে, এই হো গোষ্ঠীর মধ্যে একসময়ে আর্য রক্তে সংমিশ্রণ সবচেয়ে বেশি ঘটেছিল। আদিবাসী 'হো' সমাজের বিশ্বাস, গোময় অপবিত্র বস্তু হলেও সিংবোঙ্গা তাকে পূত পবিত্র করে মর্যাদা দিয়েছেন। তাই মাঘে পরবের সময়ে একটি দিন তারা বিশেষভাবে সিংবোঙ্গার উদ্দ্যেশে গোময় নিবেদন করে। এছাড়া রাত্রে অপদেবতারা যেন বাড়ীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে না পারে সেজন্য প্রতিদিন সকালে

বাড়ীর চারপাশে উঠানে গোবর ছড়া দিয়ে বাড়ির ঘর পবিত্র করে। খাওয়া-দাওয়ার পর এঁটো জায়গা গোবরদিয়ে পরিস্কার করে শুদ্ধ করে। মৃতদেহ বাড়ী থেকে নিয়ে যাবার পর গোবর ছড়া দিয়ে বাড়ী ঘর শুদ্ধ করে।

তাদের দেখে অন্যান্য আদিবাসী সমাজও এই গোময়ের ব্যবহার গ্রহণ করেছে। আর আর্যরা যখন অনার্য রমণীদের বিবাহ করতে শুরু করে তখন থেকেই বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অনার্য রমণীদের পালিত গোময় ব্যবহারও গ্রহণ করে।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি আদিবাসী সমাজের দান বলে অধিকাংশ পন্ডিতেরাই গণ্য করেছেন। শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয় দেবতাদের আহ্বান করার জন্য। পূজা-অর্চনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা ও অন্যান্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করলে সমস্ত কাজে শুভ ফল পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস। কিন্তু তারা তো লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করেন। আকাশে-বাতাসে আলোড়ন সৃষ্টি করে আহ্বান না করলে তাদের পার্থিব উপস্থিতি উপলব্ধি করা যাবে কি করে? তাই শঙ্খধ্বনি, শিঙ্গাধ্বনি, উলুধ্বনি, ঢাক-ঢোল, কাড়া, নাকাড়া ঘন্টা বাজিয়ে দেবতা দের আহ্বান করা হয়। মূলত বাঙালী হিন্দু সমাজের সকল প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান (যেগুলিকে স্ত্রী আচার বলে অবিভিত করা হয়) আদিবাসী রমণীদের অবদান।

আজও আদিবাসীরা শিকারের সময়ে শিঙ্গাধ্বনি দিয়ে শিকার দেবতাকে আহ্বান জানায়। শিকার যাত্রা যেন শুভ হয় এজন্য শিঙ্গাধ্বনি। কিন্তু আদিবাসী সমাজে প্রকৃতি পূজার প্রাধান্যই সর্বাধিক। তাদের ধ্যান-ধারণায় প্রকৃতির মধ্যেই আছে আত্মাবস্তু। আত্মাবস্তু আছে বলেই প্রকৃতি সজীব এবং তার অন্তরালে একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। এজন্যই তারা প্রাকৃতিক জগতের প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর অন্তরালে অদৃশ্য শক্তিকে বিভিন্ন দেবদেবী কল্পনা করে শ্রদ্ধা জানায়।

বঙ্গীয় সংস্কৃতির উপর প্রক-বৈদিক প্রভাব নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলেচনা করলাম। প্রগৌতিহাসিক যুগ থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে যেমন বাঙালী জোতির উদ্ভব, তেমনি বঙ্গীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহু বিচিত্র ধারায় উদ্ভাসিত। ভারতবর্ষে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলার সংস্কৃতি বহু জনমতে বহুল সরস ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন। অবশ্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু বাংলার সংস্কৃতি বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে আসছে। একদিকে নদী ধৌত পলিমাটিপুষ্ট সমতল ভূমির সবুজ শ্যামলতা অন্যদিকে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ভূমির লাল কঙ্কর মৃত্তিকার আপাত রুক্ষতা বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে । মোট কথা বাংলার সংস্কৃতি বাংলার ভূ-প্রকৃতি এবং তার প্রভাবে লালিত জনজীবনেরই একটা সামগ্রিক অভিব্যাক্তি।

সুপ্রচীন কাল থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দিক থেকে এসে বাংলার মাটিতে বসতি স্থাপন করে এখানকার বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে একাত্বভাবে মিশে গিয়েছে। তাদের মিশ্রণে বঙ্গ সংস্কৃতিও বিবিধ সাংস্কৃতিক উপাদানে পরিপুষ্ট হয়ে এক সমৃদ্ধ সম্পন্ন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। ইদানীংকালে কেউ কেউ দেশবাচক 'বঙ্গ' শব্দটিও অনার্য ভাষাগত বলে মনে করেছেন। ড. সুহৃদ ভৌমিকের মতে - "অস্ট্রিক 'বোঙ্গা' শব্দ থেকেই 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি। বোঙ্গা সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি কোলগোষ্ঠীর দেবতা সদৃশ অতিপ্রাকৃত শক্তি। তার মনে করে পৃথিবীতে বোঙ্গাহীন স্থান নেই। বোঙ্গা সর্বত্র বিরাজিত। সমগ্র ভূ-ভাগ বোঙ্গার

দ্বারা আবদ্ধ।এ দেশকে তাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় 'বোঙ্গা দিশম' (বঙ্গা দিশম-বঙ্গ দেশম-বঙ্গ দেশ) নামে অভিহিত করেছিল। কথাটি রীতি মত চিন্তানীয়। দেশটিও অনাদিত অনন্তরে নামে (তাদের ভাষায় বংগা - বোঙ্গা নামে) অভিহিত করে রাখবে। তাইতো স্বভাবিক। পরবর্তী কালে সে নাম সু -সংস্কৃত হয়েছে। বাংলার এমন বহু স্থান নাম আছে যেগুলিকে সংস্কৃত, আরবী ,ফরাসী ভাষায় দৃষ্টিতে বিচার করা যায় না। অথচ সহজেই কোলগোষ্ঠীর ভাষার তদ্ভব রূপ দিয়ে বিচার করা যায় না। এগুলি মূলতঃ কোল ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের দেওয়া নাম। বঙ্গদেশের নামের ব্যাখ্যায় আদিম প্রকৃতি নির্ভর গোষ্ঠীগুলির স্বাভাবিক আত্মিক সম্পর্ক কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণেয়' আমরা প্রথম বঙ্গ নামটি পাই। যেখানে বঙ্গবাসীদের বয়াংসি বা পক্ষীজাতীয় বলে বর্ননা করা হয়েছে।

"প্রজা হি তিস্রঃ অত্যায়র্মীয়ুরীতি যা বৈ তা ইস্যঃ প্রজা তিস্রঃ,
অত্যায়মায়ং স্থানীমানি বয়ংসি বঙ্গাকাধাশ্বের পাদাঃ।"

ঋষি মহিদাস ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনা করেন এবং তিনি ঋষিপুত্র হলেও তাঁর মা ছিলেন ইতরা বা শুদ্রা জাতীয়া রমণী বোধহয় কোল জাতির সঙ্গে ছিল তাঁর রক্তের সম্পর্ক । ঋষি মহিদাস এই শ্লোকে বঙ্গবাসীদের চিত্র তুলে ধরেছেন।

এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার

ক। এই অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সনাতনী জনজাতি- সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্ঠা করেছি।

খ। আধুনিক বৃহৎ বঙ্গ- সংস্কৃতির সাথে এর (জনজাতি- সংস্কৃতির) থফাৎ কতখানি রয়েছে তাও বর্ণণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

গ। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে এই জনজাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজ সচেতন মানুষের কথাকেও সমান ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্ট হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

১। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা)ঃ- দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ)পৃ - ৬।

২।মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা)ঃ- দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ) পৃ - ৮।

৩। মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পা)ঃ- দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ) পৃ - ১০।

৪। বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথঃ- বঙ্গসংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব, পরিবেষক সুবর্ণরেখা মার্চ, ১৯৯২ , প্রথম সংস্করন পৃ - ৪।

৫। ভৌমিক,সুহৃদ কুমারঃ- বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য জানুয়ারী ২০০৯ প্রথম প্রকাশ, পৃ ১২।

৬। মাহাত, পশুপতি প্রসাদঃ- রাঢের জাতি ও কৃষ্টি।

৭। দে সুশান্তঃ- প্রক্কণ পত্রিকা, খিরিন্দা, পঃ মেদিনী পুর।

৮। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০২/০৫/২০১৪, তথ্যদাতা আকাশ কোড়া, গুড়াবেন্দা, ঝাড়খন্ড।

৯। দে সুশান্তঃ- প্রক্কণ পত্রিকা, খিরিন্দা, পঃ মেদিনী পুর।

১০। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০২/০৫/২০১৪, তথ্যদাতা আকাশ কোড়া, গুড়াবেন্দা, ঝাড়খন্ড।

১১। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০২/০৫/২০১৪, তথ্যদাতা আকাশ কোড়া, গুড়াবেন্দা, ঝাড়খন্ড।

১২। লাহিড়ী কেদার নাথঃ- ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

১৩। ভট্টাচার্য প্রভাত কুমারঃ- লোক কথা ও সংস্কৃতি।

১৪। সাহা বাসুদেবঃ- বাংলায় লোক-সংস্কৃতি ও জীবনানন্দ।

১৫। দে তাপস কুমারঃ- ভারতের নাট্য সংস্কৃতি।

১৬। শুর অতুলঃ- বাঙালী ও বাঙালীর বিবর্তন।

১৭। সেনগুপ্ত কান্তি প্রসন্নঃ- দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস।

১৮। সেনগুপ্ত কান্তি প্রসন্নঃ- দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস।

১৯। চট্টোপাধ্যায় গৌরিপদঃ- দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার ইতিহাস।

২০। পোদ্দার সুস্মিতাঃ- লোকসংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

২১। ভট্টাচার্য সুশীল কুমারঃ- ভারতের লোক ইতিহ্য।

২২। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা ০২/০৫/২০১৪, তথ্যদাতা আকাশ কোড়া, গুড়াবেন্দা, ঝাড়খন্ড।

২৩। ভৌমিক প্রোবোধ কুমারঃ- Lodha of West Bengal.

২৪। ভৌমিক R.K.:- Some aspects of Indian Anthropology.

২৫। বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথঃ- বঙ্গসংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব, পরিবেষক সুবর্ণরেখা মার্চ, ১৯৯২ , প্রথম সংস্করন, পৃ ৫৪।

২৬। বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথঃ- বঙ্গসংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব, পরিবেষক সুবর্ণরেখা মার্চ, ১৯৯২, প্রথম সংস্করন, পৃ ৬১-৬৫।

২৭। বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথঃ- বঙ্গসংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব, পরিবেষক সুবর্ণরেখা মার্চ, ১৯৯২ প্রথম সংস্করন, পৃ ৬৩-৬৭।

২৮। বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথঃ- বঙ্গসংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব, পরিবেষক সুবর্ণরেখা মার্চ, ১৯৯২ , প্রথম সংস্করন, পৃ ৬৬-৭০।

।।উপসংহার।।

প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সুবর্ণরেখা নদীর সুদীর্ঘ বিস্তীর্ণ গতিপথ ও ভৌগোলিক পরিচিতির ঐতিহ্য বিরাজমান। সেই ঐতিহাসিক কাল থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে এলাকার জনজাতি-সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে সুবর্ণরৈখিক জনজাতি সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরাই আমার গবেষাণা অভিসন্দর্ভের বিশেষ উদ্দেশ্য।

বৈচিত্র্যময় এই এলাকায় যেমন বিচিত্র লোক গান, লোককথা, লোক-সংস্কৃতি, লোক-ক্রীড়া তেমনই বিচিত্র তিন রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার অন্তর্ভুক্ত সুবর্ণরেখা নদীর পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিতে কর্ম মুখর জনজীবনে লোক জীবন যাত্রার প্রবাহমান গতি আজ যেন কোথায় আটকে গেছে। বর্তমানে ঝাঁ-চকচকে শপিংমল, শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন, টিভি, সিডি, কম্পিউটার, ডিভিডি, ইলেকট্রনিক্স খেলনা প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে শান্ত সুন্দর গ্রামীণ সমাজ আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। ছোট্ট শিশুর হাতে আজ লাটিম থাকে না, তার বদলে থাকে খেলনা মোবাইল, মেশিনগান ইত্যাদি। এই হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে পরিকল্পিতভাবে গলাটিপে হত্যা করা হচ্ছে। আজ আমরা অর্থ আর চাকুরীর ইঁদুর দৌড়ে-দৌড়াচ্ছি। শিশুরা খেলার মধ্যে নেই। বোস্টুমিকে আর কীর্ত্তন করতে দেখা যায় না, মা কাকিমারা কড়ি খেলা ছেড়ে টিভির সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত। বিভূতিভূষণের অপুরা মায়ের কাছে আর রূপকথার গল্প শোনে না। ঠাকুমারও নাতি নাতনিদের রাজপুত্তুরদের গল্প বলে না। অর্থের চক্রান্তে আজ ঠাকুরদা-ঠাকুমারা বৃদ্ধাশ্রমে, আমরা এখন আনন্দ চাই। কোন কিছুর বিনিময়ে আনন্দকে ত্যাগ করা যায় না। সন্ধ্যের বৈষ্ণব কীর্ত্তনের পরিবর্তে মান হারানো মহুয়া ফুলের রসে পাড়ায় পাড়ায় হিন্দি সিনেমার তালে তালে নৃত্যের ছড়াছড়ি। কিন্তু সংস্কৃতিকে যে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এমন কিছু লোকসংস্কৃতির উপাদান আছে তথাকথিত উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের কাছে ও অনুকরণীয়। কাজেই সেই সব ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবান সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। আর তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য জনমতকে এগিয়ে আসতে হবে। সংস্কৃতি মানুষে মিলনের সেতু বেঁধেছে। অমৃতের স্বাদ যুগিয়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে ।

প্রতিটি জাতি গোষ্টী স্ব স্ব ঐতিহ্যের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন, এই মূল্য বোধকে তার স্থায়িত্ব দানের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কালের চক্রে রাজনেতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতির অনিবার্য পরিবর্তনে বিশেষ কোনো জাতি গোষ্ঠীর উপযুক্ত মুল্যবোধগুলির পরিবর্তন ঘটে। সেই দিকটি বিচার করলে আমরা দেখব অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত জীবনে ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। নগর জীবনের

সংস্কৃতির ঢেউ অববাহিকা অঞ্চলে এসে আছড়ে পড়েছে। মানুষ এখানে হয়ে পড়েছে অনুকরণপ্রিয় এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি নির্মম ও উদাসীন। ফলে এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির ধারা একদিন যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, সেকথা কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারবে না। এ অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রাচীন ধারা, তার পরিবর্তন এবং আধুনিক রূপ বিশ্লেষণ করে এর একটা সামগ্রিক রূপ প্রদানের চেষ্টা করেছি। কালের ধারায় এ অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রাচীন রূপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলেও আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভ এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে বলেই মনে করি।

এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানগত পরিবেশ, অধিবাসীদের জীবন বাস্তরতা ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রভাব মানুষদের ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি সদা সহিষ্ণু করে তুলেছে। এই সাথে বৈষ্ণব ধর্মের অবদানকেও গুরুত্ব দিতে হয়। বৈষ্ণ ধর্মাচারের বাড়াবাড়ি এখন না দেখা গেলেও, কথাটি অগ্রাহ্য করার মত নয়। করণ ও সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের দ্বারাই সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সীমান্ত বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করে। শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই নয়, বনবাসী জনগোষ্ঠীও এই ধর্মাচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। পৌষ সংক্রান্তিতে সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি জনজাতির লোকেরা স্নান সেরে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামীদের প্রনাম করার রীতি মান্য করে চলেন। এর পর উল্লেখ করতে হয় নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠীর কথা। উচ্চবর্ণের সেবায় এঁদের জীবন ও জীবিকা হত, অথচ তাদের পরিচয় চল-অচল জাতি হিসাবে। মাঝি, বাগদি, খাদাল, নম শুদ্র, জেলে, পোদ, কাঁড়রা, হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। এঁরা আচার-আচরণ হিন্দুধর্মের আচার-বিচার অনুসারী। এদের পূজা অর্চনায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা আসেন, তবে সেই সব ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সমাজ ব্রাত্যরূপে পরিচিত হয়ে পড়েন। এই সাথে ধোপা, নাপিত, মালি সম্প্রদায়ের অধিবাসীরাও প্রায় প্রতি গ্রামে বাস করেন। এঁরা প্রকৃত সমাজবন্ধুর মতই সকলের সেবা করে থাকেন। সমাজ এদের গুরুত্ব বলে মেনে নেয়। ফলে সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির অসুবিধা হয়নি।

সর্বোপরি উল্লেখ্য, পশ্চিমাগত জনজাতি গুলির কথা। সাঁওতাল, ভুমিজ, মুন্ডা, মাহতো প্রভৃতি সম্প্রদায় এঁদের অন্তর্ভুক্ত। এঁরা দলগতভাবে বসবাসে আগ্রহী। লায়হা, নায়েক, পাহান প্রভৃতির নেতৃত্ব এঁদের উপর অধিক। এই সম্প্রদায়গুলি নিজ নিজ ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আচার-আচরণ মান্য করে থাকেন। এঁরা গান-উৎসবে আগ্রহী। এঁদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিছু বেশি। এঁরা বাইরের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশের বদলে নিজ নিজ ঐতিহ্যের প্রতিই অধিক শ্রদ্ধাশীল। সাঁওতাল-ভূমিজ-মুণ্ডারা প্রধানতঃ কৌলীয় ভাষাভাষী। বাংলা ভাষার খুব অল্পই এঁরা গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের সূত্রে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এঁরা বাংলা ভাষা

শিখেছেন। এছাড়া শ্রমজীবি জনগন মালিকের সাথে যোগাযোগের জন্য বাংলা ভাষা রপ্ত করেছেন। এঁরা পালা পর্বণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকেন। পণ্ডিতেরা এ দেশের আধুনিক সভ্যতাও এঁদের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। এ ভাবেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা 'বিবিধের মাঝে দেখি মিলন মহান' এর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছেন।

।। গ্রন্থপঞ্জি।।

১) ঘোষ বিনয়; পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশভবন, কলি., ১৯৯২।

২) দাশ বিনোদ শঙ্কর রায়; মেদিনীপুর, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড।

৩) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ; পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খণ্ড, পরিবেশক সুবর্ণ রেখা-১৯৯৯ কলি.।

৪) ভট্টাচার্য,তরুণদেব; পশ্চিমবঙ্গদর্শন, মেদিনীপুর, ফার্মা. কে. এল. এম. প্রা. লি. ১৯৭৯ কলি. ।

৫) মাইতি বঙ্কিমচন্দ্র; দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়াত সংস্কৃতিঃ বিদিশা প্রকাশনী । নারায়ণগড়, মেদিনীপুরঃ ১৩৭৯।

৬) মাহাত পশুপতি প্রসাদ; ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, সুজন পাবলিকেশন কলি. ১৯৯৫।

৭) রায় প্রণব; মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, প্রত্নতত্ব অধিকার, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পঃবঃ সরকার, ১৯৮৬।

৮) ঘোষাল ছন্দা; লোকসংস্কৃতি বিচিত্রাঃ বাঁকুড়া, লোকসংস্কৃতি একাদিমি বাঁকুড়া, ২০০২।

৯) করণ সুধীর; সীমান্ত বাংলার লোকযানঃ করুনা প্রকাশনী, ১৪০২কলি.।

১০) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্যও সংস্কৃতি বিভাগ (প্রকাশকঃ- জেলা লোক সংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, মেদিনীপুরঃ লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রঃ মধুসূদন মঞ্চ ঢাকুরিয়া, কলি. ৬৮,২০০২জানুযারী।

১১) মাহাত যুগল কিশোর; বন বাদাড়ের মন (কাব্য)ঃ বামুনডিহা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

১২) মাহাত ভূপেনচন্দ্র; হামদের স্বাধীনতা (কাব্য) মুদ্রনীঃ ঝাড়গ্রম, পশ্চিম মেদিনীপুর আগষ্ট-১৯৯৮।

১৩) মুখ্যোপাধ্যায় সুব্রত; সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়াঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার ২০০১ কলি.।

১৪) পুরাকাইত নিখিলেশ; বাংলা অসমীয়া ও উড়িয়া উপভাষার ভৌগোলিক জরিপঃ সুবর্ণরেখাঃ ১৯৮৯. কলি.।

১৫) ভৌমিক সুহৃদকুমার; আদিবাসীদের ভাষা ও বাংলাঃ মারাংগুরু প্রেসঃ মেছেদা মেদিনীপুর ১৯৯৯।

১৬) সুর, অতুল; বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তনঃ সাহিত্য লোকঃ কলি. ১৯৯৪।

১৭) শীল বেনীমাধব (সম্পা); সাঁওতালী ভাষা শিক্ষা। অক্ষয় লাইব্রেরী, কলি-৬।

১৮) মুরমু বিশ্বনাথ; সাঁওতালী শব্দাবলী ও ভাষা শিক্ষাঃ ফার্মা. কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ ১৯৯৫।

১৯) ঘোষাল ছন্দা; ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপঃ লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া কলি- ৬৮,২০০৪ ডিসেম্বর।

২০) নায়েক জীবেশ; প্রসঙ্গঃ দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা জন শিক্ষা প্রসার সমিতী, ঝাড়গ্রম ১৯৬৯।

২১) ঘোষাল ছন্দা; ডাঁয়া ঝাড়গাঁয়ীঃ ঝাড়গ্রাম সন্নিহিত সুবর্ণরৈখিক লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা, বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি একাদেমি ২০০২ ।

২২) List of Other Backwand Classes :- Sofor declared in west Bengal : Dated - 18.07.94 -11.02.97.

২৩) পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী/তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রিদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বইকেনায়/মাধ্যমিক পরীক্ষার ফী ও আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের আবশ্যিক দেয় ফী এর জন্য সরকারী বৃত্তি আবেদনপত্র; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যান বিভাগ, পশ্চিমমেদিনীপুর।

২৪) ভৌমিক সুহৃদ কুমার; বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্যঃ প্রকাশক, সন্দীপন ভট্টাচার্য মন্দিরপাড়া জগাধা, হাওড়া - ৭১১১১১, জানুয়ারী ২০০৯।

২৫) ভৌমিক শ্যামাপদ; বৈচিত্র্যময় মেদিনীপুরের ইতিহাসঃ ইন্দ্রনাথ মজুমদারঃ সুবর্ণরেখা কলি. ৯,১৯৯৯ সেপ্টেম্বর ।

২৬) জানা মিললেন্দু; সুবর্ণ অববাহিকাঃ টুসু গানে প্রেম ভাবনা (প্রবন্ধ) সঞ্চয়ন পত্রিকা, ভট্টর কলেজ, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর মার্চ ২০০৭।

২৭) রায় নীহার রঞ্জন; বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দেজ ষষ্ঠ সংস্করণ মাঘ ১৪১৪।

২৮) ঘোষ বিনয়; বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, প্রকাশ ভবন ২য় প্রকাশ।

২৯) ভট্টাচার্য, আশুতোষ; লোক সাহিত্যের ইতিহাস- (১ম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২।

৩০) চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ; লোকায়ত দর্শন নিউ এজ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, আষাড় ১৪১৩।

৩১) বাস্কে, ধরেন্দ্রনাধ, বন্দ্যোপাধ্যায় সুধীর সম্পাদিত; লোক সংস্কৃতি, বিদিশা প্রকাশনি ১৯৯৫।

৩২) রানা. সন্তোষ, রানা কুমার; পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, প্রজ্ঞা প্রকাশনী ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯।

৩৩) বিশাই, শঙ্করঃ- বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী লোকজীবন ও সংস্কৃতি দেজ অপসেট, কলকাতা -৭৩।

৩৪) চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ; লোকায়ত পশ্চিমরাঢ় প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মধুসুদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৬৮।

৩৫) শেখ ইসলাম মকবুল; লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞান তত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, অজন্তা প্রিন্টার্স,কলকাতা - ৭০০০০৯।

৩৬) কুমার শ্যাম; ঝাড়খণ্ডঃ এক বিস্তৃত অধ্যায়ন প্রথম প্রকাশ ২০০৪, প্রিয়া কম্পিউটার রাঁচি - ৮৩৪০০১।

৩৭) বালা অর্ধেন্দু শেখরঃ- মেদিনীপুরের স্থান নাম (প্রকাশকালঃ অজ্ঞাত)।

৩৮) দাস অসীম; বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)।

৩৯) ভট্টাচার্য তরুণদেব; মেদিনীপুর (প্রকাশকালঃঅজ্ঞাত)।

৪০) সিংহ শান্তি; জেলা লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ, মেদিনিপুরের ঝুমুর, টুসু।

৪১) মজুমদার দিব্যজ্যোতি; টুসুর ইতিহাস ও সংগীতে ।

৪২) বেরা নলিনী; শবর চরিত(উপন্যাস)।

৪৩) বসু স্বপন ও চৌধুরী-ইন্দ্রজিত (সম্পাদিত); ঊনিশ শতকের বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতি।

৪৪) সেনগুপ্ত কান্তি ও বাগচী, কেপি; দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস।

৪৫) বসু স্বপন ও দত্ত , হর্ষ(সম্পাদিত); বিশ শতকের বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতি।

৪৬) হালদার গোপাল; বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গে।

৪৭) বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ; বাংলার লৌকিক দেবতা ।

৪৮) চৌধুরী দুলাল; বাংলার লোক উৎসব।

৪৯) সেনগুপ্ত পল্লব; পূজা পার্বণের উৎস কথা।

৫০) সুর অতুল; বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন ।

৫১) দাস বিনোদ শঙ্কর; মেদিনীপুরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিবরণ।

৫২) চক্রবর্তী বরুণ কুমার; লোক উৎসব ও লোক দেবতা প্রসঙ্গে।

৫৩) পালুই লক্ষীকান্ত; জঙ্গলমহল থেকে ঝাড়গ্রাম।

৫৪) সেনগুপ্ত কান্তি প্রসন্ন ঃ- দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস।

৫৫) বাক্যে ধীরোন্দ্রনাথ ঃ- বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক্ - বৈদিক প্রভাব, পরিবেষক সুবর্ণরেখা ৭৩. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৬ (দ্বিতীয় সংসকরণ)।

৫৬) মল্লিক দীপঙ্কর; বাংলা উসন্যাসে জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি, দিয়া পাবলিকেশন অক্টবর ২০১৫ (প্রথম প্রকাশ) ।

৫৭) ঘোষ প্রদ্যোত; বাংলার জনজাতি, মার্চ, ২০০৭ (প্রথম প্রকাশ)।

৫৮) চট্টোপাধ্যায় শিব প্রসাদ; লোকায়ত পশ্চিম রাঢ়, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ (পঃ বঃ সরকার), জুন, ২০০৭ (প্রথম প্রকাশ) ।

৫৯) টুডু কানাইলাল; সাঁওতালী ভাষা ও লেখাশেখা।

।।পত্রপত্রিকা।।

(১)দাস রমানাথ, অড় (মানভূম লোক সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা) ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০৮ পুরুলিয়া।

(২)মিত্র সনৎ কুমার, লোক সংস্কৃতি গবেষণা (অরণ্য ও লোক সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা), ১৩ তম বর্ষ ৩ সংখ্যা, বইমেলা, লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ।

(৩)এবং সায়কঃ- ৩৫ বর্ষ শারদ সংখ্যা, ২০০৯।

(৪)সৃজন ঃ- বিশেষ সংখ্যা, মেদিনীপুরের লোক সংস্কৃতি (মার্চ, ২০১০) সৃজনী প্রকাশন, কুশপাতা, ঘাটাল।

(৫) মিশ্র যতীন্দ্রনাথ (সম্পাদক); সাঞ্চয়ণ পত্রিকা (দ্বিতীয় প্রয়াস) বাংলা বিভাগ, ভট্টর কলেজ, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর, মার্চ, ২০০৭।

(৬) স্বদেশ চর্চালোক; গোষ্ঠী, সমাজ, সম্প্রদায় শারদ সংখ্যা ১৪২০।

।।অভিধান।।

১। দাশ ক্ষুদিরাম (সংকলক), সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান প্রথম প্রকাশঃ আগষ্ট, ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা।
২। মন্ডল, সুশীল কুমারঃ- রাঢ়ের শব্দ ও সংস্কৃতি আভিধান, প্রথম প্রকাশঃ ৬ ডিসেম্বর, ২০০৭, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা।
৩। মাহাত বঙ্কিমচন্দ্র ঃ- ঝাড়খণ্ডি বাংলা শব্দকোষ, প্রথম প্রকাশ, বাঁধনা পরব ১৪১১, কালবেলা, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।

সুবর্ণরেখা নদীর প্রবাহ পথের মালভূমি অঞ্চল

সুবর্ণরেখা নদীর উপর নির্মিত চান্ডিল বাঁধ

সুবর্ণরেখা নদীর প্রবাহপথের দৃশ্য

সুবর্ণরেখা নদীতে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য

নয়াগ্রামের রামেশ্বর মন্দির

সুবর্ণরেখা নদীর সঙ্গম স্থল